দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

৭৮ বর্ষ, ১৩ সংখ্যা।।
২৪ নভেম্বর, ২০২৫
৭ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২।। যুগাব্দ - ৫১২৭
website : www.eswastika.com

ভারতের জনজাতি সমাজ
ভারতীয় সমাজেরই
অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ— পৃঃ ২৩

ভগবান বীরসা মুণ্ডার জন্মসার্ধশতবর্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য

কুটুম্ব প্রবোধন → লক্ষ্য

যৌথ পরিবার

সংগঠিত পরিবার

সশক্ত পরিবার

সুস্থ পরিবার

সুরক্ষিত পরিবার

সমর্থ পরিবার

সম্পন্ন পরিবার

সুসংস্কৃত পরিবার

সমৃদ্ধ পরিবার

ব্যবস্থিত পরিবার

প্রভাবশালী পরিবার

আদর্শ পরিবার

প্রতিষ্ঠিত পরিবার

সন্তুষ্ট পরিবার

সুখী পরিবার

আনন্দিত পরিবার

আপনার এলাকায় কুটুম্ব প্রবোধন গতিবিধির কেন্দ্র খুলতে চাইলে
এই নম্বরে যোগাযোগ করুন— ৯৮৩৬৪৪৫৫২২ (9836445522)

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৮ বর্ষ ১৩ সংখ্যা, ৭ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

২৪ নভেম্বর - ২০২৫, যুগাব্দ - ৫১২৭,

Website : www.eswastika.com

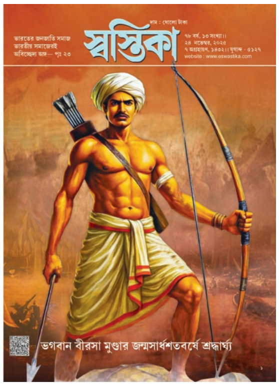

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন-এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

যাঁরা অঙ্গ সৃষ্টি করেননি তাঁরা জাতীয় মন্ত্রের অঙ্গহানি করেন কী করে? বন্দে মাতরম্ ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

পরের স্টেশন কালীঘাট ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

ভারতকে অস্থির করার নেপথ্য কৌশল ◻ অরুণ কুমার চক্রবর্তী ◻ ৮

যদি ওরা আবার ফিরে আসে? ◻ বিপ্লব বিকাশ ◻ ৯

এসএসসি পরীক্ষায় সমস্যা তৈরি করে শিক্ষা দুর্নীতি অব্যাহত রাখল রাজ্য সরকার ◻ কৌটিল্য ◻ ১০

বন্দে মাতরম্—এক যুগবাহিত রাষ্ট্রীয় জীবনবোধ ◻ বিদ্যুৎ মুখার্জি ও ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ◻ ১১

শ্রীভূমির মাটিতে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত নিশ্চিতভাবে ইউনুসের উত্তর-পূর্বের দাবিকে আরও জোরালো করবে ◻ রঞ্জন কুমার দে ◻ ১৩

স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতীয় জনজাতিরা রেখেছে প্রখর প্রতিরোধের স্বাক্ষর ◻ অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায় ◻ ১৫

ভারতের জনজাতি সমাজ ভারতীয় সমাজেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ◻ প্রণবজ্যোতি ভট্টাচার্য ◻ ২৩

জনজাতি স্বাভিমান রক্ষার অগ্রদূত ভগবান বীরসা মুণ্ডা ◻ সরোজ চক্রবর্তী ◻ ২৬

বারো হাজার বছরের প্রাচীন এক নিত্য পূজাস্থল বাঘোর ◻ দেবাশিস চৌধুরী ◻ ৩১

এক আত্মত্যাগের নাম—বর্বরীক ◻ সমাপ্তি সামন্ত ◻ ৩৪

বাঙ্গালির 'আত্মপরিচয়' নিয়ে বিভ্রান্তির অবসানে এক মহাজীবন— ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ◻ পিন্টু সান্যাল ◻ ৩৫

বিহারের নির্বাচন থেকে পশ্চিমবঙ্গের শাসকদল শিক্ষা নেবে কি? ◻ প্রদীপ মারিক ◻ ৩৮

পরিবেশ-বান্ধবে অর্থনীতিতে ভারতে অবস্থান—সংস্কৃতি, নীতি ও অর্থনৈতিক রূপান্তর ◻ ড. জয়ন্ত চৌধুরী ◻ ৩৯

সিউড়ী সংশোধনাগারে তারাশঙ্করের আবক্ষমূর্তি প্রসঙ্গে তারাশঙ্কর স্মৃতি সাহিত্য সমাজের কিছু কথা ◻ দেবাশিস মুখোপাধ্যায় ◻ ৪৩

রাষ্ট্রীয় ভাবনাই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ভাবনা ◻ গীতাঞ্জলি ◻ ৪৬

গল্পকথায় ডাক্তারজী : সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস ◻ ৫০

নিয়মিত বিভাগ :

◻ **চিঠিপত্র : ১৯-২০** ◻ **অঙ্গনা : ২১** ◻ **সুস্বাস্থ্য : ২২** ◻ **সমাবেশ সমাচার : ২৮-৩০** ◻ **খেলা : ৩৮** ◻ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১** ◻

প্রকাশিত হবে
১ ডিসেম্বর
২০২৫

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে
১ ডিসেম্বর
২০২৫

হিন্দুত্ব

ভারতের জীবনধারার নাম হিন্দুত্ব। এটিই ভারতের পরিচিতি। একথা জাতিকে মনে করে দিয়েছেন চন্দ্রনাথ বসু, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, বীর সাভারকর প্রমুখ মনীষী।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এ বিষয়েই আলোকপাত করবেন অরুণকুমারজী, ড. সত্যনারায়ণ মজুমদার, দেবযানী ভট্টাচার্য্য, কেয়া ঘোষ, শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী প্রমুখ।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :

INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**

Kolkata-700 006

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০ টাকা (মোট ২৮০০) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা) পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

ভারতীয় সমাজের অভিন্ন অঙ্গ

ইহা প্রমাণিত সত্য যে, ভারতের জনজাতি সমাজ ভারতীয় জনজীবনের অভিন্ন অঙ্গ। রামায়ণ-মহাভারত এবং বিভিন্ন পৌরাণিক আখ্যানে ইহার বহু উল্লেখ রহিয়াছে। তাঁহারা স্ব-স্ব সামাজিক, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও ভারতীয় সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। রামায়ণে শবর, নিষাদ ও বানর জনজাতির উল্লেখ রহিয়াছে। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীবাদির সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া তাহাদিগের সাহচর্যে প্রবল পরাক্রান্ত অত্যাচারী রাবণকে নিধন করিয়াছেন। বনবাসী গুহককে আলিঙ্গন করিয়াছেন। শবরীমাতার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিয়াছেন। মহাভারতে মহাবলশালী ঘটোৎকচকে জনজাতি সমাজোদ্ভূত বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে। তিনি ছিলেন মধ্যমপাণ্ডব ভীম ও হিড়িম্বা রাক্ষসীর পুত্র। মণিপুরের জনজাতি সমাজের রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদাকে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পুত্র বভ্রুবাহনও অর্জুনের ন্যায় মহাবীর ছিলেন। সুপ্রাচীন কাল হইতে বিভিন্ন উপজাতি ও জনজাতির মানুষেরা ভারতীয় জনসমুদ্রে একাত্ম হইয়া জাতিগত ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য রচনা করিয়া ভারতীয় সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামেও তাঁহাদের ভূমিকা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। ইসলামি শাসনকালে ভীল জনজাতির মানুষরা মহারাণা প্রতাপ সিংহের সেনাবাহিনী এবং মাওয়ালি জনজাতির মানুষেরা ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের সেনাবাহিনীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছেন। ইসলামি শাসনের বিরুদ্ধে গোণ্ড জনজাতির রানি দুর্গাবতী একজন অকুতোভয় রানি রূপে পরিচিত ছিলেন। ইংরাজ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানকল্পে সমগ্র ভারতে জনজাতি যোদ্ধাদিগের নাম ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। ভারতের গৌরবময় স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁহাদিগের দীর্ঘ অবদান রহিয়াছে। ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে মূর্তিমান প্রতিরোধ হিসাবে ভগবান বীরসা মুণ্ডা, সিধু-কানু, ফুলো-ঝানো, তানা ভগত, বুধু ভগত, তিলকা মাঝি, জিতু সর্দার; উত্তর-পূর্ব ভারতের রানি গাইদিনল্যু; দক্ষিণ ভারতে অল্লুরি সীতারামা রাজু-সহ অংসখ্য জনজাতি যোদ্ধার নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই বৎসর ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্বশ্রেষ্ঠ জনজাতি যোদ্ধা ভগবান বীরসা মুণ্ডার সার্ধশতজন্মবার্ষিকী। কয়েক বৎসর পূর্বেই ভারত সরকার তাঁহার জন্মদিবসকে 'জনজাতি গৌরব দিবস' রূপে ঘোষণা করিয়া সমগ্র জনজাতি সমাজের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ তাঁহার জন্মসার্ধশতবর্ষ উপলক্ষ্যে সমগ্র সমাজকে সঙ্গে লইয়া শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছে।

কিন্তু অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় হইল, সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ শাসকরা ভারতমাতার রক্ষক জনজাতি সমাজকে মূল ভারতীয় সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার প্রয়াস করিয়াছে। তাহারা ভারতীয় সমাজকে দীর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৩০ সালে তাহাদিগকে 'আদিবাসী' পরিচয় প্রদান করিয়াছে। তাহার বহু পূর্ব হইতেই সেবার আড়ালে তাহারা সহজ সরল জনজাতি সমাজকে ধর্মান্তরিত করিয়া ভারতবিরোধী করিয়া তুলিবার কার্য শুরু করিয়াছে। অতীব দুঃখের বিষয় যে, স্বাধীন ভারতেও জনজাতি সমাজের মানুষদিগকে ধর্মান্তরিত করিবার এবং তাহাদিগকে হিন্দু সমাজ হইতে পৃথক করিবার অপচেষ্টা চলিতেছে। ভারতের সংবিধান প্রণেতাগণ ভারতীয় সংবিধানে ইংরাজকৃত 'আদিবাসী' শব্দটিকে স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা তফশিলি উপজাতি অথবা জনজাতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা সত্ত্বেও সেকুলার ও বামমনস্ক তথাকথিত বুদ্ধিজীবীগণ নিরন্তর জনজাতিদিগকে বৃহত্তর সমাজ হইতে পৃথক করিবার অপচেষ্টা অব্যাহত রাখিয়াছে। সুখের বিষয় যে, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার জনজাতিদিগের সার্বিক উত্থানের নিমিত্ত বিধিধ প্রকারের উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পর হইতেই বনবাসী কল্যাণ আশ্রম জনজাতি সমাজের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য নানাবিধ প্রকল্প পারিচালনা করিতেছে। ইহা অত্যন্ত গৌরবের বিষয় যে, ভারতের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদ রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করিতেছেন জনজাতি সমাজের মহিলা প্রতিনিধি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু।

সুভাষিতম্

পরিবর্তিনি সংসারে মৃতঃ কো বা ন জায়তে।
স জাতো যেন জাতেন যাতি বংশঃ সমুন্নতিম্।। (ভর্তৃহরি নীতিশতক)

অর্থ ঃ পরিবর্তনশীল এই সংসারে এমন কে আছে যার জন্ম অথবা মৃত্যু হয়নি? প্রকৃতপক্ষে তার জন্ম সার্থক,যার জন্মের কারণে বংশের গৌরব বৃদ্ধি হয়েছে।

যাঁরা অঙ্গ সৃষ্টি করেননি তাঁরা জাতীয় মন্ত্রের অঙ্গহানি করেন কী করে?

বন্দে মাতরম্

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

কুরুসভায় পাঞ্চালী পিতামহ ভীষ্মকে প্রশ্ন করেছিলেন, যুধিষ্ঠির নিজে হেরে গিয়ে অন্যকে বাজি ধরেন কী করে? গঙ্গাপুত্রের কাছে কোনো সদুত্তর ছিল না। মুসলমান তোষণকে নজরে রেখে ১৯৩৭ সালে জাতীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র রচিত ভারতের জাতীয় মন্ত্র 'বন্দে মাতরম্'কে ব্যবচ্ছেদ করে, তার অঙ্গহানি ঘটায়। এটা লজ্জার ও বেদনার। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাতে সায় দিয়েছিলেন বলে প্রচারিত হয়। গুরুদেব বিশ্বকবি। কিন্তু এ মন্ত্র তাঁর সৃষ্টি নয়। এ মন্ত্রের উদ্গাতা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র। যে মন্ত্র ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টি, যে মন্ত্র সে সময়ের কোনো কংগ্রেস নেতা সৃষ্টি করেননি, তার অঙ্গহানি ঘটানোর অধিকার তারা পেলেন কী করে? সেই সময়েও কিছুটা রাজনৈতিক গা-জোয়ারি করেই সে অনধিকার চর্চা হয়েছিল। কোনো মন্ত্রের অঙ্গহানি বা ব্যবচ্ছেদের জন্য তার স্রষ্টার অনুমতির প্রয়োজন। কংগ্রেস নেতারা মন্ত্রের ২৪টি পঙ্ক্তির মধ্যে মাত্র ৬টি পঙ্ক্তি গাওয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তার কারণ বাকি ১৮টি পঙ্ক্তির প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে দুর্গাস্তব ও দুর্গাস্তোত্র। তাই বন্দে মাতরমের অঙ্গহানি ঘটিয়ে তারা দেশমাতৃকাকেই খণ্ডিত করেছিলেন, দেশাত্মবোধকে হত্যার প্রয়াস করেছিলেন।

মুসলমানদের মন পাওয়ার চেষ্টা কংগ্রেস আর বিদেশি বামেদের নতুন নয়। তাই উভয় দল ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্র থেকে মুছে যাচ্ছে। ইসলামে 'আল্লা' ভিন্ন অন্য বন্দনা নিষিদ্ধ। তা বলে সনাতন হিন্দুধর্ম দুর্গারূপে যে দেশমাতৃকাকে আরাধনা করে তাকে খণ্ডিত করতে হবে? এটা কুযুক্তি! উভয়ের অধিকার সংরক্ষিত। সনাতনী পরম্পরা তাই বলে। তাহলে কংগ্রেস নেতারা মুসলমানদের মাথাব্যথা উপশমের জন্য নিজেদের মাথা কাটলেন কেন? ভারতমাতার অঙ্গচ্ছেদ করলেন কেন?

ঋষি অরবিন্দ তাঁর সহধর্মিণী মৃণালিনীদেবীকে লিখেছিলেন, দেশকে তিনি 'মা' বলে জানেন ও মানেন। 'কর্মযোগিন' পত্রিকায় তিনি বন্দে মাতরমের প্রথম ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন। পাহাড়-পর্বত, নদী, মাঠঘাট আর জঙ্গল দিয়ে সেই 'মা'কে ব্যাখ্যা করা যায় না। আর তাঁর বুকের ওপর বসে যদি কোনো রাক্ষস রক্তপান করে, তবে তাঁর সন্তানরা তা মেনে নেবেন না। ঋষি অরবিন্দর আদর্শে উদ্বুদ্ধ বিপ্লবীরা অত্যাচারী ব্রিটিশ রাজভৃত্যদের বিরুদ্ধে গোপনে সশস্ত্র বিপ্লব পরিচালনার সংকল্প গ্রহণ করেন। দৃঢ়প্রত্যয়ী বিপ্লবীরা স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। আলিপুর বোমা মামলায় শ্রী অরবিন্দের এক বছরের নির্জন কারাবাস হয়। তিনি লিখেছিলেন ভারতবর্ষের প্রথম জেল-ডাইরি 'কারাকাহিনী'। এরপর পুলিশি নজর এড়িয়ে ফরাসি উপনিবেশ পণ্ডিচেরি থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত অব্যাহত রেখেছিলেন বিপ্লবী কার্যকলাপ। অর্থ ও অস্ত্রের অভাবে পরে পিছিয়ে আসতে হয়।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একদম সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, দলীয় স্বার্থ রক্ষায় কংগ্রেস সে সময় বন্দে মাতরমের বলি চড়িয়েছিল। জওহরলাল নেহরু কংগ্রেস সভাপতি থাকাকালীন বন্দে মাতরমের অঙ্গহানি ঘটানো হয়। হন্যে হয়ে মুসলমান তোষণের ব্যাখ্যা খুঁজতে 'গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ এর অনুমোদন দিয়েছেন'—এহেন তত্ত্বও খাড়া করেছিল। তারা এসব রাস্তা নেওয়ার কারণে কবি বুদ্ধদেব বসুকে সে দুঃখের কথা লিখেছিলেন গুরুদেব। নেতাজী সুভাষচন্দ্রকেও পড়তে হয়েছিল বিড়ম্বনায়। এই ঘটনার কয়েক মাস পরেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সভাপতি হন সুভাষচন্দ্র। ওয়ার্কিং কমিটিতে নেহরুপন্থীরা দলে ভারী হওয়ায় নেহরুর সভাপতিত্বে গৃহীত বন্দে মাতরমকে খণ্ডিত করার প্রস্তাব খারিজ করা সম্ভবপর হয়নি। হতে পারে সামাজিক, সাম্প্রদায়িক সমন্বয় ভারতের সনাতনী ভাবধারার অংশ। কিন্তু তা শিরোধার্য হলেও জাতীয় মাতৃমন্ত্রকে খণ্ডিত করা অসমীচীন। ঐতিহাসিক সব্যসাচী ভট্টাচার্য তাই সঠিক লিখেছিলেন যে, বন্দে মাতরম্ নিছক কোনো জাতীয় গান নয়, যাকে কেবল বইয়ের পাতার মধ্যে আটকে রাখা যাবে। বন্দে মাতরম্ সেই অনন্যসাধারণ, অনুপম জাতীয় ভাবনা ও আবেগ যা বইয়ের পাতার বাইরে বিকশিত হয়েছে। এর কোনো বিকল্প নেই। (তথ্যসূত্র— 'বন্দে মাতরম্ : দ্য বায়োগ্রাফি অফ এ সং')।

কেবল মুসলমান স্বার্থে এত বড়ো ঐতিহাসিক ভুল সেই সময়ে সংঘটিত হয়। ঋষি বঙ্কিম প্রয়াত হন তার ৪৩ বছর আগে (১৮৯৪)। বেঁচে থাকলে তাঁর সৃষ্ট মন্ত্রের অঙ্গচ্ছেদ তিনি যে মেনে নিতেন— এ এক নিছক কষ্টকল্পনা। কোনো কবি এরকম অনুমোদন দিয়েছেন তারও তেমন কোনো নজির নেই। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে মুসলমান তোষণকে ভারতের রক্তে মেশানোর চেষ্টা করেছে কংগ্রেস ও বিদেশি বামেরা। নিজেদের বিকিয়ে দিয়ে ব্যবহৃত হতে চেয়েছে তারা। যে ভুল সে সময়ের কংগ্রেস নেতারা করেছিলেন এবার তা শুধরে নেওয়ার সময় এসেছে। তাই ঋষি অরবিন্দ রচিত দুর্গাস্তোত্র দিয়েই ইতি টানছি--- "মাতঃ দুর্গে।। সিংহবাহিনী সর্বশক্তিদায়িনী মাতঃ শিবপ্রিয়ে।। বীরমার্গপ্রদর্শিনী এসো। আর বিসর্জন করিব না।। এসো মাতঃ আমাদের মনে প্রাণে শরীরে প্রকাশ হও।।"

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

পরের স্টেশন কালীঘাট

দিদি গো দিদি,

ভগীরথ যখন মা গঙ্গাকে মর্ত্যে নিয়ে এসেছিলেন তখন বিহার পার করেই সুরেশ্বরী গঙ্গার পুণ্যধারা বঙ্গপ্রদেশে এসেছিল। সম্প্রতি বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ফলের পরে সেই কথা মনে করিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বলেছেন পরের স্টেশন কালীঘাট।

তবে দিদি, আপনার পোষা পিসি-মিডিয়া নিয়ে কোনো কথা হবে না। একভাবে প্রচার করা হচ্ছে, দিদির লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পথেই বিহারে জয় এসেছে। কিন্তু সত্যিই কি তাই দিদি! আপনি তো জানেন, বিহারের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের অনেক ফারাক। এখানে যে টাকাটা দেওয়া হয় সেটা ভাতা। সেটা আপনার দান। মহিলা ভোট কেনার জন্য এই বুদ্ধি দিয়েছিলেন প্রশান্ত কিশোর। মানে পিকে। জন সমাজ পার্টি গড়ে ক্ষমতায় আসার স্বপ্ন দেখে বিহারে পিকে ফিকে হয়ে গিয়েছেন।

দিদি, আপনি নিশ্চয়ই এটাও জানেন যে, বিহারের মহিলাদের জন্য যে টাকা সেটা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির জন্য। প্রায় দেড়কোটি মহিলার অ্যাকাউন্টে সম্প্রতি এককালীন ১০ হাজার টাকা পাঠিয়েছিল নীতীশ সরকার। সেই সঙ্গে ছিল প্রতিশ্রুতি--- ক্ষমতায় ফিরলে অন্য মহিলাদেরও একই অঙ্কের অর্থ দেবেন। এই প্রকল্পটির নাম 'মুখ্যমন্ত্রী মহিলা রোজগার যোজনা'। কোনো অসম্মানের ভাতা নয়। মহিলাদের আয়ের পথ প্রশস্ত করার পরিকল্পনা।

আপনি অবশ্য আলাদা দিদি। আপনি বলেন, রাজ্যে সব মহিলাই বিভিন্ন প্রকল্পের আন্ডারে। মাসে মাসে টাকায় অনেকের সংসার চললেও, বড়ো অংশের মহিলারা সাজগোজের জিনিস আর মোবাইল ফোন রিচার্জেই খরচ করে দেন। কিন্তু বিহারের প্রকল্পে মহিলাদের জন্য স্বনির্ভর কাজের সুযোগ রয়েছে। যাঁরা ১০ হাজার টাকায় কোনো কাজ শুরু করবেন, তাঁরা ভবিষ্যতে ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত পেতে পারেন। বুঝুন দিদি, পিসি-মিডিয়ার লোকেরা আপনার জন্য কতটা মিথ্যা প্রচার করতে পারে।

একটায় মাহিলাদের জন্য সম্মানজনক আয়ের সুযোগ করে দিয়ে স্বনির্ভর করে দেওয়া, আর অন্যটায় মানে পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার সরকারের উপর নির্ভর করে দেওয়া। বিহারেরটা উৎসাহ দেওয়া আর পশ্চিমবঙ্গেরটা ঘুষ, ভিক্ষা, ভাতা যেকোনো নামেই ডাকা যেতে পারে। আরও একটা কথা দিদি, বিহার দিচ্ছে রাজ্যের আয় থেকে। আপনি দেন ধার করে। আশা করি আমি বোঝাতে পারলাম। না, আর একটা উপায় আছে। মদ বিক্রি করা টাকায় লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। মদ খেয়ে স্বামী বউ পেটায় আর বউ সেই মদের লাভের টাকা পেয়ে দিদির গান গায়। পশ্চিমবঙ্গের মহিলাদের কী যে বোকা বানিয়েছেন না আপনি! আপনার জবাব নেই।

দিদি, একটা সময়ে বিহার ছিল বিমারু রাজ্যের অন্যতম। কেন্দ্রে কংগ্রেস থাকার সময়ে অনুন্নয়নের জন্য বিহার, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশ--- এই চারটি রাজ্যকে বলা হতো বিমারু। এখন এই চার রাজ্যই উন্নয়ন ও আইনশৃঙ্খলার নিরিখে অনেক এগিয়ে। পশ্চিমবঙ্গের থেকে তো অনেক যোজন এগিয়ে।

দু'দশক আগে নীতীশ কুমার যখন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন, তার আগে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ভয়াবহ অবনতি ছিল। দিদি, আপনার সমালোচকরা বলছে, লালুপ্রসাদের আরজেডি জমানার সেই 'জঙ্গলরাজ'-এর সঙ্গে একমাত্র এখনকার পশ্চিমবঙ্গের তুলনা চলে। তাঁরা এটাও বলছেন, বিহারে বিজেপি জোট সরকারের প্রচেষ্টায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, পানীয়জল, কৃষি এবং যুব কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে।

আরও একটা কথা বলছে সবাই। আবাস যোজনা থেকে সড়ক নির্মাণ বা আয়ুষ্মান ভারত— কেন্দ্রের সব প্রকল্পের সুবিধা নিয়ে রাজ্যের উন্নয়ন ঘটিয়েছে বিহার সরকার। সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকা উন্নত হয়েছে। আর তার উপরে ছিল মোদী হাওয়া। যে সুপবন পশ্চিমবঙ্গেও বইতে শুরু করেছে। আর তাতেই তো আতঙ্ক হচ্ছে গো দিদি!

তাই তো আমি পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে বলছি, বিহারের অধিবাসীদের আর বিহারি বলে অপমান করতে চাইবেন না। তাঁদের ঘুম কিন্তু আমাদের আগে ভেঙেছে। উন্নাসিক বাঙ্গালি যাঁদের মেড়ো, খোট্টা, উড়ে, পাঁইয়া বলে চিরকাল তাচ্ছিল্য করেছে তাঁরা এখন অনেক এগিয়ে।

এসব আমার কথা। কিন্তু আমার তো অন্য ভয় দিদি। ভারতের মানচিত্রটা পুরো গেরুয়া হয়ে গিয়েছে। মোদী যা বলছেন তাতে তো দিদি আপনার মতো আমারও আপনার অনুগত ভাই হিসেবে ভয় করছে। সবার সব প্রশ্নের কী যে উত্তর দিই! একটু বলে দেবেন দিদি প্লিজ। □

কেন্দ্রে কংগ্রেস থাকার সময়ে অনুন্নয়নের জন্য বিহার, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশ— এই চারটি রাজ্যকে বলা হতো বিমারু। এখন এই চার রাজ্যই উন্নয়ন ও আইনশৃঙ্খলার নিরিখে অনেক এগিয়ে। পশ্চিমবঙ্গের থেকে তো অনেক যোজন এগিয়ে।

ভারতকে অস্থির করার নেপথ্য কৌশল

অরুণ কুমার চক্রবর্তী

ভারত আজ বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো গণতান্ত্রিক দেশ। একদিকে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, আন্তর্জাতিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে, অন্যদিকে দেশকে অস্থির করার জন্য নানা ষড়যন্ত্র সক্রিয়। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর বিষয় হলো— ইসলামিক উগ্রপন্থীদের ভূমিকা। তারা কেবল ধর্মীয় আবেগকে ব্যবহার করছে না, বরং ডিপ স্টেটের মদত, মুসলমান অনুপ্রবেশ ও জনবিন্যাসের পরিবর্তন— এই তিনটি বিষয়কে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে ভারতের স্থিতিশীলতা নষ্ট করার কৌশল নিয়েছে।

১. ইসলামিক উগ্রপন্থা : মূল দর্শন ও কৌশল : ভারতে ইসলামিক সমাজের একটি বড়ো অংশ শান্তিপ্রিয় হলেও, উগ্রপন্থী একটি অংশ আরব সাম্রাজ্যবাদ ও পাকিস্তানি প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে দেশবিরোধী কাজ করছে। আইএসআইএস, আল-কায়েদা, লস্কর-ই-তৈবা, জইশ-ই- মহম্মদ— এসব সংগঠনের ভাবধারা ভারতে মুসলমান যুবকদের একটি অংশকে বিপথে টেনে নিচ্ছে। ধর্মীয় আবেগকে উসকে দিয়ে 'হিন্দুদের বিরুদ্ধে জেহাদ' চালানোর বার্তা দেওয়া হচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়া ও গোপন নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে তরুণদের প্রলুব্ধ করা হচ্ছে।

২. ইকোসিস্টেমকে ব্যবহার করার কৌশল : ভারতে ইকোসিস্টেম বলতে বোঝানো হয়— আমলাতন্ত্র, মিডিয়া বুদ্ধিজীবী মহল, কর্পোরেট ও রাজনৈতিক গোষ্ঠীর নেপথ্য প্রভাব। মুসলমান উগ্রপন্থীরা এটিকে দুইভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করে—

(ক) দুর্বলতা কাজে লাগানো : প্রশাসনিক জটিলতা, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বিচারব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতা— এগুলোকে উগ্রপন্থীরা সুযোগ হিসেবে নেয়। **উদাহরণ :** অনেক সময় সন্ত্রাসবাদীদের গ্রেপ্তারের পর মামলার ফাঁকফোকরে তারা ছাড়া পেয়ে যায়।

(খ) ভেতরে অনুপ্রবেশ : গোয়েন্দা সংস্থা বা পুলিশ বাহিনীর মধ্যে কিছু দুর্বল বা দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হয়। সরকারি নথি ফাঁস, ভেতরের তথ্য বাইরে পাঠানো— এসব ক্ষেত্রে উগ্রপন্থীরা সুবিধা পায়।

৩. বিদেশি অনুপ্রবেশ : সীমান্তকে অস্ত্র বানানো : ভারত চারদিকে বিশাল সীমান্ত দ্বারা ঘেরা। এর মধ্যে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও মিয়ানমারের সীমান্ত মুসলমান উগ্রপন্থীদের কার্যকলাপের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

(ক) পাকিস্তানের ভূমিকা : পাকিস্তানের আইএসআই সরাসরি জঙ্গি গোষ্ঠীগুলোকে অর্থ ও অস্ত্র সরবরাহ করে। কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে ভারতের অভ্যন্তরে অস্থিরতা ছড়ানো তাদের মূল লক্ষ্য।

(খ) বাংলাদেশ সীমান্ত : অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা কেবল অর্থনৈতিক কারণে আসে না, অনেকেই চরমপন্থী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরায় এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি। স্থানীয় রাজনীতি ও ভোটব্যাংককে এই অনুপ্রবেশকারীরা ব্যবহৃত হচ্ছে, ফলে সমস্যার সমাধান আরও কঠিন হচ্ছে।

(গ) মিয়ানমার সীমান্ত : রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের একটি অংশ মানবিক কারণে আশ্রয় পেয়েছে, কিন্তু এর মধ্যেই উগ্রপন্থী উপাদান ঢুকে পড়েছে। এর পরবর্তীতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অস্থিরতা সৃষ্টি করতে ভূমিকা রাখছে।

৪. জনবিন্যাস পরিবর্তন : কৌশলগত অস্ত্র : মুসলমান উগ্রপন্থীরা জানে— ভারতকে সরাসরি যুদ্ধ করে হারানো সম্ভব নয়। তাই তারা ডেমোগ্রাফিক পরিবর্তনকে দীর্ঘমেয়াদি কৌশল হিসেবে নিয়েছে।

(ক) নির্দিষ্ট এলাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি : সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে দ্রুত মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে। ধর্মান্তরণ, একাধিক বিবাহ ও উগ্র সংগঠনের সহায়তায় জনসংখ্যার ভারসাম্য বদলে দেওয়া হচ্ছে।

(খ) ভোটব্যাংক রাজনীতি : রাজনৈতিক দলগুলো এই জনবিন্যাসকে ভোটের জন্য ব্যবহার করছে। মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় আলাদা পরিচয় ও প্রশাসনিক দাবি উসকে দেওয়া হচ্ছে।

(গ) পৃথকীকরণ প্রবণতা : নির্দিষ্ট এলাকায় মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে গেলে সেখানে হিন্দুদের বঞ্চিত করা, ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা তৈরি করা হয়। কাশ্মীরে যেমন ঘটেছে, তেমন পরিস্থিতি অন্যান্য রাজ্যেও তৈরির চেষ্টা চলছে।

৫. মিডিয়া ও প্রোপাগান্ডা : বিভ্রান্তির কৌশল : আন্তর্জাতিক স্তরে মুসলমান উগ্রপন্থীরা ভারতকে 'সংখ্যালঘু-বিদ্বেষী দেশ' হিসেবে তুলে ধরছে। মানবাধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা ইত্যাদি অজুহাতে ভারতের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা চলছে। মিডিয়ার মাধ্যমে অপপ্রচারের দ্বারা ভুয়া খবর, গুজব ছড়িয়ে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা উসকে দেওয়া হচ্ছে।

৬. সমন্বিত প্রভাব : কীভাবে অস্থিরতা তৈরি হয় : মুসলমান উগ্রপন্থীরা যখন ডিপ স্টেটের সহায়তা, বিদেশি অনুপ্রবেশ ও জনবিন্যাস পরিবর্তন— এই তিনিটি হাতিয়ার একসঙ্গে ব্যবহার করে, তখন ভারতের নিরাপত্তা সংকট তৈরি হয়। সন্ত্রাস ও দাঙ্গা ঘটে। সীমান্ত রাজ্যগুলিতে রাজনৈতিক অস্থিরতা আনে। জনসংখ্যার ভারসাম্য বদলে দীর্ঘমেয়াদি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের পথ প্রশস্ত হয়। আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়।

এর সমাধান ও প্রতিরোধ কৌশল :

(ক) ইকোসিস্টেমের প্রভাব খর্ব করা : আমলাতন্ত্র ও গোয়েন্দা সংস্থাকে দুর্নীতি ও রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করতে হবে। প্রযুক্তি ও তথ্যনির্ভর গোয়েন্দা কার্যক্রম বাড়াতে হবে।

(খ) সীমান্ত সুরক্ষা : বাংলাদেশ, মিয়ানমার ও পাকিস্তান সীমান্তে নজরদারি কঠোর করতে হবে। অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের শনাক্ত ও পুশব্যাক নীতি কার্যকর করতে হবে।

(গ) জনবিন্যাস রক্ষার নীতি : জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে আইন প্রয়োগ করা জরুরি। ধর্মান্তরণের নামে বেআইনি কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে।

(ঘ) নাগরিক সচেতনতা : মুসলমান সমাজের মধ্যেই উগ্রপন্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও সংস্কৃতির মাধ্যমে যুবকদের মূলধারায় আনা জরুরি। ভারত যদি সময়মতো প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেয়, তাহলে এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবে। □

যদি ওরা আবার ফিরে আসে!

বিপ্লব বিকাশ

এখন পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে একদিকে অদ্ভুত নীরবতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে আর অন্যদিকে মানুষের মনে ভয় ও ভ্রম ছাড়ানোর জন্য একদল নেতা-নেত্রী উঠে পড়ে লেগেছেন। এসআইআর-এর প্রক্রিয়া শুরু হতেই বহু বছর ধরে এই মাটিতে বাস করা কিছু মুখ আচমকা উধাও হয়ে গেছে। কেউ রাতারাতি বাড়ি ছেড়েছে। কেউ কাজের জায়গায় অন্য কাউকে রেখে বলেছে 'দুই-এক মাস পরে সব ঠিক হয়ে গেলে ফিরে আসবে।' আর এই নীরবতার মাঝেই প্রশ্নটা ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে, ওরা যদি আবার ফিরে আসে?

এই প্রশ্নের মধ্যে লুকিয়ে আছে বহু বছরের রাজনৈতিক স্বার্থে তৈরি এক বিপজ্জনক মানসিকতা। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে-শহরে মানুষ বরাবরই দেখেছে, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী কিছু মানুষ নিঃশব্দে এসে বসতি গড়েছে, জমি দখল করেছে, রাস্তার ধারে, নদীর চরে ঘর তুলেছে, আর ক্রমে সেই অস্থায়ী ঘরই 'চিরস্থায়ী অধিকার' দাবি করে দাঁড়িয়ে গেছে। স্থানীয়দের কেউ প্রতিবাদ করলে তাঁকে অনুপ্রবেশকারীদের মদতদাতাদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, 'মানবতার নামে বিরোধ করবেন না।' এখানেই মানবতার আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে স্পষ্ট রাজনৈতিক স্বার্থ, ভোটের অঙ্ক, আর দেশকে সংকটে ফেলার দুরভিসন্ধি।

আজ যখন রাজ্যজুড়ে এসআইআর-এর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, তখন দেখা যাচ্ছে— এই 'নাগরিক' পরিচয়ের আত্মবিশ্বাস যেন মুহূর্তে ভেঙে পড়েছে। যারা দাবি করত তারা বহু বছর ধরে এখানেই আছে, তাদের অনেকেই নীরবে সীমান্তের ওপারে ফিরে যেতে দ্বিধা করছে না। আবার কেউ কেউ রাজ্যের বাইরে আত্মগোপন করছে। কারণ তারা জানে, যে মাটিতে তারা বসবাস করছিল, তা আসলে তাদের নয়। যে নথি ধরে রেখেছিল, তা সত্যি নয়। আর যে পরিচয়কে তারা স্থায়ী করে ফেলেছিল, সেটাই এখন প্রশ্নচিহ্নের মুখে।

কিন্তু এখানেই সবচেয়ে বড়ো দুঃশ্চিন্তা, তারা আবার ফিরে আসবে না তো? কারণ এই রাজ্যে একদল মানুষ চিরকালই তাদের ফিরিয়ে আনার রাজনীতি করেছে। কখনো মানবতার নামে, কখনো সংখ্যালঘু সুরক্ষার নামে, কখনো দারিদ্র্যের দোহাই দিয়ে। অথচ এই স্লোগানগুলোর আড়ালে অভিপ্রায় রয়েছে অন্য রকম— বসতি গড়ে তোলা, জমি দখলকে বৈধতা দেওয়া এবং ভোটব্যাংককে পাকাপোক্ত করা।

প্রশাসনের নথিগুলোকে ব্যবহার করে, কখনো বিকৃতি করে, কখনো রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে, অনুপ্রবেশকারীদের 'নাগরিক সাজানোর' এক চক্র গড়ে তোলা।

ভোটব্যাংকের স্বার্থে তৈরি সেই সব নথিই আজ প্রশ্নের মুখে। সেই সব পরিচয়ই আজ সন্দেহের মুখে। তাই অনেকে আপাতত পালিয়ে গেছে। কিন্তু তারা কি সত্যিই একেবারে চলে গেছে, নাকি সুযোগ বুঝে আবার ফিরে আসবে? এই প্রশ্নটাই আজ রাজ্যের সকলের মনে তীব্র উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। কারণ যদি ওরা ফিরে আসে, তবে ফিরে আসবে শুধু মানুষ নয়, ফিরে আসবে জমি দখলের পুরোনো অভ্যাস, বেআইনি বসতি গড়ে তোলার লক্ষ্য। রাজ্যের জনবিন্যাস পালটে দেওয়া এবং রাজনৈতিক দলের ভোটব্যাংক হিসেবে কাজ করার লক্ষ্যে। যদি ওরা ফেরে, তবে ফিরে আসবে সেই অদৃশ্য প্রতিযোগিতা, যেখানে স্থানীয় শ্রমিক কাজ হারাবে, অথচ তারা কম মজুরিতে বাজার দখল করবে। যদি ওরা ফেরে, তবে আবারও দেখা দেবে সেই পুরোনো কথা, 'মানবতা'। কিন্তু হিন্দুদের মানবতার, তাদের ব্যথার হিসেব কেউ রাখবে না। সবচেয়ে বড়ো কথা, যদি ওরা ফেরে, তবে আবারও ফিরে আসবে সেই রাজনৈতিক অভিসন্ধি, যাদের কাছে জনস্বার্থ নয়, ভোটের স্বার্থই মুখ্য। তারা আবারও কোনো না কোনো অজুহাতে বলবে, 'ওদের মানবাধিকারের কথা তো ভাবুন।' অথচ এই মানবাধিকার রক্ষার নামে সবচেয়ে বড়ো ক্ষতি হয় এই রাজ্যের মানুষেরই।

আজ পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এক কঠিন সত্যের সামনে দাঁড়িয়ে। যারা আজ পালাচ্ছে, তারা স্রেফ ভয়ে পালাচ্ছে, অপরাধবোধে নয়। এবং ভয় কেটে গেলে আবারও তারা ফিরে আসতে পারে, প্রশ্রয় থাকলে, সুযোগ থাকলে এবং রাজনৈতিক দরজা খোলা থাকলে। তাই আজ প্রশ্নটা শুধু এসআইআর প্রক্রিয়ার নয়, আজ প্রশ্ন এই রাজ্যের ভবিষ্যতের।

স্বস্তিকার বিজ্ঞাপনের দরপত্র (এক সপ্তাহের জন্য)

Back Cover	(Multi Colour)	Rs. 32,000.00
Front Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Back Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Full Page	(Multi Colour)	Rs. 20,000.00
Full Page	(Black & White)	Rs. 15,000.00
Half Page	(Black & White)	Rs. 8,000.00
Qtr. Page	(Black & White)	Rs. 4,000.00

** *বিজ্ঞাপনের টাকা জমা পড়লে বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে।*

যোগাযোগ — মো : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

এসএসসি পরীক্ষায় সমস্যা তৈরি করে শিক্ষা দুর্নীতি অব্যাহত রাখল পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রায় ২৬ হাজার ছেলে-মেয়ে চাকরি খুইয়েছে, যাঁদের সকলের দোষ কিন্তু আইনগতভাবে প্রমাণিত হয়নি। কিন্তু তাদের অনেকে অনিয়ম করায় সকলেই চাকরি হারিয়েছে। 'পাবলিক এমপ্লয়মেন্ট' বা সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনোরকম দুর্নীতি হলে পুরো প্যানেল বাতিলই হলো আইন। তাই অবশ্যই দোষ প্রথমত ও প্রধানত রাজ্য সরকার, শিক্ষা দপ্তর এবং স্কুল সার্ভিস কমিশন বা এসএসসি-র। কলকাতা হাইকোর্ট এবং তারপর সুপ্রিম কোর্টে বিচার চলাকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোনো তথ্য দেয়নি বলে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বহু যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকারও চাকরি চলে গেল। কিন্তু নিছক সন্দেহের বশে কি এতগুলো লোকের চাকরি বাতিল করা যেতে পারে? যদি একজনও নিরপরাধ থাকে, তবে আইনের আদর্শ অনুযায়ী, সেই একজন নিরপরাধ ব্যক্তিরও ন্যায়বিচার প্রাপ্য। যারা অন্যায় করল, অর্থাৎ এই শিক্ষা দুর্নীতির সঙ্গে যারা যুক্ত— তারা এখনও শাস্তি পেল না, আর যাদের অন্যায় প্রমাণিত নয় তারা শাস্তি পেল? যাই হোক সুপ্রিম নির্দেশে বলা হয় ডিসেম্বরের মধ্যে এই শূন্যপদগুলিতে পুনরায় নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে এবং ততদিন যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত নয়, তাঁরা স্কুলে পড়াতে পারবেন। এটা কী ধরনের বিচার হলো তা হয়তো বলতে পারে একমাত্র সুপ্রিম কোর্ট। আইনের চোখে সবকিছু হওয়া উচিত সাদা বা কালো। অর্থাৎ কেউ অপরাধী এবং কেউবা নিরপরাধ। এখানে ধূসর রং কোথা থেকে এল?

কিন্তু এই রায়ে কিছুটা অক্সিজেন পেয়ে নতুন খেলা শুরু করল রাজ্য সরকার। পুনর্নিয়োগের ক্ষেত্রে চাকরিহারা শিক্ষকদের চাকরি পাওয়ার বিষয়টি পাকা করতে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের '১০ নম্বর' দেবে বলে ঠিক করে শিক্ষা দপ্তর ও এসএসসি। ভালো কথা। 'রিক্রুটমেন্ট রুলস্' বা নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিধি প্রণয়নের অধিকার তো শিক্ষা দপ্তর ও এসএসসি-র রয়েছে। কিন্তু রাজ্য সরকারি দুর্নীতির ধারাটি যে অব্যাহত রইল তা হলো বেসরকারি স্কুলে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা বা অন্য রাজ্য, যেমন বিহার বা ঝাড়খণ্ডের স্কুলে পড়ানোর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নম্বর না দেওয়ার নীতি গ্রহণ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও এসএসসি। সঙ্গে আরও বড়ো সমস্যা হলো— ফ্রেশার্স ক্যান্ডিডেট, যাঁদের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা নেই, তাঁরা ৭০-এ ৭০ পেয়েও পাশ করতে পারলেন না এই নতুন নিয়মে। যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের সামনে খুললো না শিক্ষকপদে নিয়োগের দরজা। অর্থাৎ, সুপ্রিম নির্দেশমাফিক সংঘটিত সাম্প্রতিক এসএসসি পরীক্ষাটির কোনো মূল্যই থাকছে না। এদিকে রাজ্যে এসএসসি পরীক্ষা প্রায় ৯ বছর পর হচ্ছে। তাহলে গত এক দশকে পাশ করা ছেলেমেয়েরা কোথায় যাবেন? যাঁরা শিক্ষাক্ষেত্রে কর্মসংস্থান প্রাপ্তির জন্য উচ্চশিক্ষা অর্জন করলেন, তাঁদের ভবিষ্যৎ কী দাঁড়াবে? এটি পরীক্ষা হলো না প্রহসন? যদি এরকম নিয়মই করা হয়ে থাকে, তাহলে ফ্রেশার্স চাকরিপ্রার্থীদের তো পরীক্ষায় বসতে দেওয়াই উচিত হয়নি এসএসসি-র।

তাহলে দেখে নেওয়া যাক ঠিক কারা এই দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবস্থার শিকার। (১) ২০১৬-তে পরীক্ষা দেওয়া ৩০ লক্ষ ছেলে-মেয়ে এবং তাঁদের পরিবার। (২) চাকরি হারানো ১৮ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে যাঁরা 'যোগ্য' (অর্থাৎ নিয়ম মাফিক পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পেয়েছিলেন বা চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনোরকম দুর্নীতির আশ্রয় নেননি), কিন্তু বয়স বা নানা কারণে এবার পাশ করতে পারবেন না। (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, একবার আইএএস পাশ করা অফিসারের পক্ষেও ১০ বছর পর ফের ওই পরীক্ষা পাশ করা কঠিন নয়, প্রায় অসম্ভব।) (৩) ২০১৬ থেকে ২০২৫— এই ৯ বছর যাঁরা কলেজ- বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কোর্সে পড়াশোনা করে পাশ করলেন, কিন্তু এসএসসি পরীক্ষা না হওয়া বা আজকের এই অদ্ভুত সিস্টেমের কারণে যাঁরা চাকরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলেন। তাঁদের অনেকেই এবারের পরীক্ষায় ৭০-এ ৭০ পেয়েও ইন্টারভিউতে সুযোগ পাওয়া থেকে বঞ্চিত। (৪) বেসরকারি স্কুলে পড়ানো শিক্ষকরা, যাঁদের শিক্ষক জীবনের অভিজ্ঞতাকে এসএসসি ধরছে না। (৫) অন্য রাজ্যে চাকরি পাওয়া শিক্ষক, যাঁরা ভেবেছিলেন এবার নিজের রাজ্যে (অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে) ফিরে আসতে পারবেন। (৬) এই বছর পরীক্ষা দেওয়া, শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাহীন, কিন্তু যোগ্য ৫ লক্ষ চাকরিপ্রার্থী। (৭) গত ১০ বছরে সরকারি স্কুলে পড়াশোনা করা প্রায় দেড় কোটি গরিব ছাত্র-ছাত্রী।

কিন্তু এসবের বিপ্রতীপে রাজ্য সরকারের কি কিছুই করার ছিল না? উত্তর হলো— অবশ্যই ছিল। (১) রাজ্য সরকার প্রতি বছর নিয়ম মাফিক এসএসসি পরীক্ষা নিতে পারত। (২) শিক্ষাক্ষেত্রে বহু শূন্যপদ রয়েছে, যা পূরণ করলে কোনো সমস্যাই হতো না। শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং নতুন চাকরিপ্রার্থী (ফ্রেশার্স) সবাই সুযোগ পেতেন। (৩) কলকাতা হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টে ২০১৬-র প্যানেলের যোগ্য-অযোগ্যদের তালিকা তুলে দিয়ে 'যোগ্য'দের বাঁচাতে পারত পশ্চিমবঙ্গ সরকার। (৪) বিভিন্ন রাজ্য-সহ বেসরকারি শিক্ষাক্ষেত্রে যুক্ত সকলের অভিজ্ঞতাকে স্বীকৃতিদান করতে পারত রাজ্য সরকার। (৫) সর্বোচ্চ আদালতের কথা শুনে ২০১৬-র চাকরিপ্রার্থী এবং ২০২৫-এর চাকরিপ্রার্থীদের জন্য পৃথক পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে পারত এসএসসি। যত আসনে শিক্ষা দপ্তর নিয়োগ করতে চলেছে, তার অন্তত ১০ গুণের বেশি আসন শূন্য রয়েছে।

তাহলে কেন রাজ্য আবার নতুন সমস্যা তৈরি করল? উদ্দেশ্য একটাই— ফের আদালতকে দিয়ে এই পুরো প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেওয়া। কারণ এতরকম অনিয়ম হলে বিচারবিভাগের দ্বারস্থ হবে অনেকেই। সেই সব মামলা উচ্চ আদালতে সমাধান হতে সময় লাগবে। উচ্চ আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে রাজ্য আবার সর্বোচ্চ আদালতে যাবে। আবার সময় লাগবে। এর মধ্যে ফের ভোট এসে যাবে। ততদিন ধরে এই মাস্টারমশাইদের মাইনে ভোটারদের মধ্যে বিলি করে ভোট কিনবে তৃণমূল কংগ্রেস। পরের বছর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী থাকলে অনির্দিষ্টকাল ধরে রাজ্যের এই সমস্যা বহাল থাকবে। অন্য কোনো দলের নেতৃত্বাধীন নতুন কোনো সরকার রাজ্যে ক্ষমতাসীন হলে, তারা এই সমস্যার সমাধানে যদি উদ্যোগ নেয় তবে কিছু সুরাহা হলেও হতে পারে। তখন তারা শিক্ষক নিয়োগ করে সেই বছরের বাজেট থেকে তাঁদের মাইনে দেবে। আর নয়তো বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর একটু সুবিধেই হবে। কারণ এই বছরের বাজেটে শিক্ষকদের জন্য বরাদ্দ মাইনেকে নানা সামাজিক প্রকল্পে বিলিয়ে কেনা যাবে ভোট। □

বন্দে মাতরম্
এক যুগবাহিত রাষ্ট্রীয় জীবনবোধ

বিদ্যুৎ মুখার্জি ও ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

মর্যদা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ভ্রাতা লক্ষ্মণকে বলেছেন, 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী', অর্থাৎ মাতৃভূমি স্বর্গ থেকেও শ্রেষ্ঠ। বর্তমান যুগের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মাতৃভূমিকে অধিক মহিমায় মণ্ডিত করে আমাদের সমবেতভাবে দর্শন করালেন 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র। মন্ত্রের কল্যাণে দেশব্যাপী অখণ্ড বোধের বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলো দেশ জননীই যে মা! মাতৃকা সাধনার এক অনবদ্য দর্শন। মায়ের যে অনন্ত রূপ! দেশমাতৃকাও একটি রূপ এবং দেশের সেবা করলেও তাঁকেই সেবা করা হয়! তিনিই দেশভক্তির অর্ঘ্য গ্রহণ করেন! তাই 'ভারতমাতা' রূপে ধ্যানই হোক জীবন সাধনা। দেশমাতৃকার নিত্য আরতিই হোক সর্বকর্ম। 'বন্দে মাতরম্' সেই বোধে সঞ্জাত এক মহামন্ত্রধ্বনি। যে মন্ত্র পাঠ করে অমৃতলোকের পথযাত্রী না হয়ে মাতৃভক্তরা মৃত্যুলোকে প্রবেশ করতে বিন্দু মাত্র সময় নেন না। দেশকে সাজাতে ব্যস্ত থাকেন তাঁর প্রিয় সন্তানেরা। ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাকে অনায়াসে দূরে সরিয়ে ফাঁসির রজ্জুকে পরম আগ্রহে বরণ করে নেন তাঁরা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণে বঙ্কিমচন্দ্রের তিনটি ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাসের গুরুত্ব অসীম। এগুলি হলো আনন্দমঠ (১৮৮২), দেবীচৌধুরাণী (১৮৮৫) এবং সীতারাম (১৮৮৭)। আনন্দমঠ উপন্যাসের অন্তর্গত 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র মাতৃবন্দনার সর্বোচ্চ ভৌম-দর্শন। দেশকে 'মা' বলে সম্বোধন; যে মা আমায় আশ্রয় দিয়েছেন, দিয়েছেন খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান; যে ভূমিতে বড়ো হয়ে পেয়েছি সনাতন সংস্কৃতির সুদীর্ঘ শিকড়; যে মা আমার অন্তরাত্মা জাগ্রত করতে, ঈশ্বর উপলব্ধি করতে সহায়ক হয়েছেন— তারই বন্দনা 'বন্দে মাতরম্'। এই মহামন্ত্রপাঠে তাঁরই পূজার্চনা।

'বন্দে মাতরম্' শব্দটি পরবর্তীকালে ভারতের দুই ধারার বিপ্লবীদেরই রণধ্বনি হয়ে উঠেছিল। দেশপ্রেমিকেরা এই মহান ধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে, সুদূর নির্বাসনে অথবা ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দিয়েছেন। তবে এই গানটি লেখা হয়েছিল উপন্যাস রচনার আরও আগে ১৮৭৫ সালে। 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে তা সৌকর্য বিস্তার করে এক অভূতপূর্ব অনুভূতির পাঠ হয়ে রইলো। এরই মধ্যে ১৮৭৩ সালের ডিসেম্বর মাসে মুর্শিদাবাদ জেলার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে বহরমপুরে কর্মরত অবস্থায় কর্নেল ডাফিন সাহেবের দ্বারা অকারণে নিগৃহীত হয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। আইনের গণ্ডিতে দাঁড়িয়ে তার প্রতিশোধ নিয়েছিলেন তিনি, শেষপর্যন্ত আদালতে ক্ষমা চাইতে বাধ্য হন কর্নেল। তবে ব্রিটিশ শক্তির শোষণের ফলে সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশে দেশবাসীর মধ্যে যে তীব্র ক্ষোভ, জ্বালা, যন্ত্রণা, অপমান, লাঞ্ছনা ও পুঞ্জীভূত বেদনা স্বচক্ষে দেখেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। ব্যক্তিগত লাঞ্ছনা তাঁকে আরও বিক্ষুব্ধ করে তুলল। তারই পটভূমিকায় ১৮৭৫ সালে তাঁর 'বন্দে মাতরম্' রচনা। ১৮৭৪ সালে রচিত হয়েছে 'লোকরহস্য' যেখানে বঙ্কিমচন্দ্র শাণিত ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ ও উপহাসের মধ্যে দিয়ে 'ব্রিটিশ বিদ্বেষ' ও ক্ষোভ পুঞ্জীভূত করে সাহিত্যের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এই মানসিকতার সূচনা ঘটে ১২৮১ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে। 'কমলাকান্ত'-র দপ্তরেও এর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অনেকে বলেন, মুর্শিদাবাদ জেলার লালগড় রাজবাড়িতে বসে 'বন্দে মাতরম্' লিখেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র।

'আনন্দমঠ' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৮২ সালের ১৫ ডিসেম্বর। তাঁর আগে ১২৮৭ বঙ্গাব্দের চৈত্রমাস (১৮৮১ সালের মার্চ-এপ্রিল) থেকে ১২৮৯ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠমাস পর্যন্ত অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ধারাবহিকভাবে তা প্রকাশিত হয়। ১২৮৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যার পর ছ' মাসের জন্য 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা বন্ধ থাকে। ১২৮৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাস থেকে পুনরায় 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হলে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যাতে গিয়ে তা শেষ হয়। অর্থাৎ মোট নয়টি সংখ্যায় 'আনন্দমঠ' উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে ১৮৮২, ১৮৮৩, ১৮৮৬ (দু'টি) এবং ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে মোট পাঁচটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এতটাই তা জনপ্রিয় হয়েছিল।

তদানীন্তন সময়ের প্রায় শতবর্ষ পূর্বে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের (১১৭৬ বঙ্গাব্দ) পটভূমিকায় 'আনন্দমঠ'-এর কাহিনি নির্মিত। ইতিহাসকেন্দ্রিক উপন্যাস নয়, তবে ইতিহাসের পটভূমিকায় লেখা। উপন্যাসের দেশ-কাল ইতিহাসের অনুগত, যুগের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সঠিকভাবে প্রতিফলিত। বঙ্গের সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কিছু পরিচয় আছে। তবে বঙ্কিমের সন্ন্যাসীরা বৈষ্ণব, অথচ শক্তিই তাদের আরাধ্য। বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের উপাদান ব্যবহার করলেন কিন্তু ইতিহাস অনুসরণ করলেন না। ইতিহাস এই উপন্যাসের বিষয় ভাবনাও হলো না। কিন্তু স্বদেশপ্রেমের উজ্জ্বল শিখায় আনন্দমঠের প্রতিটি কক্ষ আলোকিত হলো। স্বদেশবোধ, মাতৃভাবনা এবং বৃহত্তর মানবিকভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন 'আনন্দমঠ'। প্রকাশের পর ধীরে ধীরে সমগ্র ভারতে স্বদেশচিন্তার বিস্ফোরক পদার্থে একে একে বহ্নি সংযোগ করল। স্বদেশি আন্দোলনে উপন্যাসটি হয়ে উঠল তূর্যধ্বনি। কারণ উপন্যাসের মন্ত্র ও প্রতীক 'বন্দে মাতরম্' স্বদেশ দেবতার নতুন ঋকমন্ত্র। দেশজননী এর দেবতা। দেশভক্তিই এর সাধ্যসাধনা।

একটি জাতির আত্মজাগরণের প্রতীক হয়ে উঠল আনন্দমঠ। একটি জাতির পুনরুত্থান। প্রশাসনের নিগড় থেকে আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সাধনমন্ত্র হলো 'বন্দে মাতরম্'। প্রশাসনের বিরুদ্ধে বাহুবল ও মনোবল

ফঃ ২

প্রয়োগে উদ্বুদ্ধ করল এই মন্ত্র। আর সারা ভারতের বজ্রবিদ্যুৎবাহী গ্রন্থ হয়ে উঠল 'আনন্দমঠ'। ১৮৭৬ সালে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত হয়, তারও অনুপ্রেরণা হয়তো 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র। এদিকে বঙ্কিমচন্দ্রও নিজেকে প্রকাশ করে চলছেন।

কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে লিখছেন, ১৮৯৬ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে 'বন্দে মাতরম্' প্রথম গাওয়া হয়। তখন বঙ্কিমচন্দ্র প্রয়াত হয়েছেন। অধিবেশন বসেছে কলকাতার বিডন স্কোয়ারে, যা ঠাকুর বাড়ির কাছে। রবীন্দ্রনাথের উপর ভার পড়েছে, গানের বাবস্থা করবার। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্'-এ সুর বসালেন। কংগ্রেসের অধিবেশনে একা এই গান গাইলেন, সরলা দেবীচৌধুরানী অর্গান বাজালেন। তখন মাইক আবিষ্কৃত হয়নি। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই প্যান্ডেলের বিপুল জনতার শেষপ্রান্ত পর্যন্ত পরিষ্কার শোনা গেল। কংগ্রেসের অভ্যন্তরেও 'বন্দে মাতরম্'-এর এই সৌকর্য এক নতুন যুগের শুভ সূচনা করলো।

ভগিনী নিবেদিতা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস 'আনন্দমঠ' থেকে এই মাতৃমন্ত্র তুলে এনে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে দিলেন। ১৯০৬ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে নিবেদিতা পরিকল্পনা করলেন জাতীয় পতাকার। তাঁরই উৎসাহে বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা চওড়া লাল চতুষ্কোণাকার পৃষ্ঠভূমির উপরে সোনালি সুতার বজ্র রচনা করে দু'ধারে বাংলায় 'বন্দে মাতরম্' লিখে দিলেন। মহাশক্তি ও আত্মবলিদানের অভিজ্ঞান চিহ্ন 'বজ্র'। এবার তা দেশমাতৃকাকে দীপ্ত সম্বোধনে একীভূত হলো। বিপ্লবী আন্দোলনের গুপ্ত সংগঠনে নিবেদিতার ভূমিকার বিষয়ে আচার্য জগদীশ চন্দ্র তাঁকে বললেন, 'বজ্র সবসময় কালো মেঘের আড়ালে থাকবে এবং আকাশের কোন প্রান্ত হতে সেই অস্ত্র ছুঁড়ে মারা হলো তা যেন শাসক জাতি জানতে না পারে।' পরবর্তীকালে 'মন্ত্রের সাধন' হলো প্রতিজ্ঞা। রংপুরের রাস্তায় 'বন্দে মাতরম্' গান করার জন্য দীনেশ রায় ওরফে প্রফুল্ল চাকী সরকারি স্কুল থেকে বিতাড়িত হলেন। ক্ষুদিরামকে গ্রেপ্তার করে পুলিশের গাড়িতে তোলবার সময় চিন্তান্বিত না হয়ে তিনি উচ্চৈঃস্বরে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দিলেন। লোকায়ত সংগীত রচিত হলো :

'তোরা প্রাণ খুলে বল 'বন্দে মাতরম্'।
তোদের ঘুমের নেশা ভাঙ্গিয়ে দিলে
ক্ষুদিরামের একটি বম্।'

এমনকী রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা এবং জন্মসূত্রে দেশপ্রেমিক ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার ছাত্রজীবনে বন্দে মাতরমের উৎসাহ ও প্রচার থেকে দূরে থাকতে পারেননি। ১৯০৭ সালে, কেশব তার স্কুলে সরকারি পরিদর্শকের সামনে বন্দে মাতরম্ ধ্বনি দিয়েছিলেন এবং এর শাস্তি হিসেবে তাকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। এটি ছিল রিসলে সার্কুলার নামক অত্যাচারী আদেশের বিরুদ্ধে যা জনসাধারণের বন্দে মাতরম্ ধ্বনিকে নিষিদ্ধ করেছিল। তবে, বন্দে মাতরমের প্রচার বন্ধ করতে সরকার যতই চেষ্টা এবং সতর্কতা অবলম্বন করুক না কেন, বাস্তবে এর প্রভাব ও প্রচার দিন দিন বেড়েই চলেছিল। পুলিশি দমন বন্দে মাতরমের জনপ্রিয়তা বাড়িয়ে দিয়েছিল।

বিপ্লবী কানাইলাল দত্ত ফাঁসির আগে ঘোষণা করেছিলেন, 'আমার মৃত্যুর পর কোনো ঈশ্বরের নাম নিও না, পারলে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দিও। ১৯৩০ সালে রাইটার্স বিল্ডিং অভিযানে বিপ্লবীদের রিভলবারের গুলিতে মৃত্যু হয় লেফটেন্যান্ট কর্নেল সিম্পসনের। অলিন্দের নিঃস্তব্ধতায় সেদিন বিনয়-বাদল-দীনেশের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল 'বন্দে মাতরম্'। ১৯৩১ সাল, বিপ্লবী দীনেশের জেলের কুঠুরি থেকে ফাঁসির মঞ্চ পর্যন্ত রাস্তাটুকু ধ্বনিত হয়েছিল 'বন্দে মাতরম্'। ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সময় ৭৩ বছরের বৃদ্ধা স্বাধীনতা সংগ্রামী মাতঙ্গিনী হাজরা 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন।

পার্শি সম্প্রদায়ের মাদাম ভিকাজি রুস্তম কামা জার্মানির স্টুটগার্ট শহরে প্রথমবার 'জাতীয় পতাকা'র রূপদান করলেন সেখানে দেবনাগরী হরফে লেখা হয়েছিল 'বন্দে মাতরম্'। প্যারিস থেকে প্রকাশিত হয়েছিল দেশাত্মবোধক মুখপত্র 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকা। সেখানে মাদাম কামা আহ্বান করলেন, আমাদের শত্রুরাই বাধ্য করছে আমাদের হিংস্র হতে। ভারতের স্বাধীনতাকামী বীরযোদ্ধারা ইংরেজদের দ্বারা দুষ্কৃতকারী বলে কেন ধিকৃত হবেন? ভারতবাসীর বিপ্লব-প্রচেষ্টা অতি পবিত্র। তাই 'বন্দে মাতরম্' এক ভারতীয় যুগবাহিত জীবনবোধ। এটি সংস্কৃত-বাংলা মিশ্রভাষায় লেখা একটি গান গানটির টেক্সট ও বন্দনাগীতির মধ্যে একটি জাতীয় মূর্তিকল্প প্রকাশিত। শ্রীঅরবিন্দ 'বন্দে মাতরম্' গানটিকে 'বঙ্গদেশের জাতীয় সংগীত' বলে উল্লেখ করেছেন। বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের মতে, 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রটি জাতিগত; ব্যক্তিগত নয়, ব্যক্তিবিশেষের জন্য নয়। অন্য সকল মন্ত্র যেমন Individual, আর বন্দে মাতরম্ মন্ত্রটি National। ঋষি শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—'Earlier Bankim was a novelist only, later Bankim is a Rishi। বঙ্কিমচন্দ্র এই যুগের ঋষি। 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রটির উদগাতা তিনি।

'বন্দে মাতরম্'-কে জাতির জীবনমন্ত্ররূপে স্বীকার করেছেন ভগিনী নিবেদিতা, ঋষি অরবিন্দ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, লোকমান্য তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল, লালা লাজপত রায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বীর সাভারকার, রাসবিহারী বসু, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অবনীন্দ্রনাথ, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিত্ব। ১৯০১ সালে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন— 'Read Bankim Chandr – Bankim Chandra and Bankim Chandra only.'

তথ্যসূত্র :

১. পশ্চিমবঙ্গ, বঙ্কিম সংখ্যা।

২. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস।

৩. বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ২০১৪, ভারতের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম, র‍্যাডিক্যাল, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৩৯, ৬৯।

৪. কালীচরণ ঘোষ, ২০১৭ (প্রথম প্রকাশ ১৯৭৩), জাগরণ ও বিস্ফোরণ দ্বিতীয় খণ্ড, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৩২-৩৪।

৫. শৈলেশ দে সম্পাদির্ত অগ্নিযুগ' গ্রন্থের অন্তর্গত, হেমচন্দ্র ঘোষ লিখিত 'বীজমন্ত্র' প্রবন্ধ।

৬. 'সংস্কার ভারতী'-পশ্চিমবঙ্গের 'বন্দে মাতরম্' সংক্রান্ত সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টসমূহ, ২০২৪-২৫।

আজকে যারা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঢালে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের পৃষ্ঠপোষকতা করছেন, তাঁরাই কিছুদিন আগে করিমগঞ্জ জেলাকে রবিঠাকুরের দেওয়া 'শ্রীভূমি' নামে উৎসর্গ করায় তীব্র বিরোধিতায় রাজপথে নেমেছিলেন।

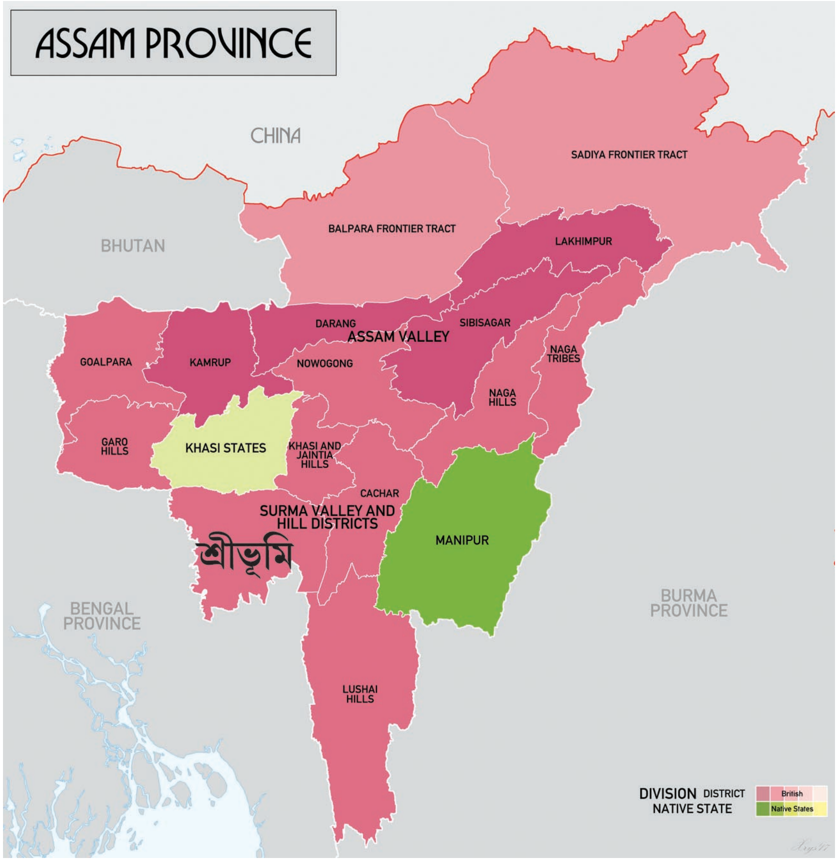

শ্রীভূমির মাটিতে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত নিশ্চিতভাবে ইউনুসের উত্তর-পূর্বের দাবিকে আরও জোরালো করবে

রঞ্জন কুমার দে

বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত রবীন্দ্রনাথ ইস্যুতে বারবার সরগরম হচ্ছে সীমান্ত জেলা শ্রীভূমি। যে কোনোভাবে জড়িয়ে যাচ্ছেন কবিগুরু, সেটা জেলাটির নাম পরিবর্তন কিংবা তাঁর রচিত সংগীতে। সম্প্রতি জেলাটিতে সর্বভারতীয় একটি রাজনৈতিক দলের অনুষ্ঠানে দলীয় এক কর্মী বিধুভূষণ দাস কবিগুরু রচিত বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের দুটি পঙ্‌ক্তি 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি গাওয়ায় নতুন এক বিতর্কের সূচনা হলো। বিতর্কের রেশ শেষ না হতেই জেলাটিতে আবার শাসক দলের এক কর্মীসভায় ভুলভাল জাতীয় সংগীতের পরিবেশনায় বিরোধীরা সমালোচনায় মুখর হয়েছে। রবি ঠাকুরের গান বিশ্বের দুটি দেশের জাতীয় সংগীত, সেটা একজন ভারতীয় এবং বাঙ্গালি হিসেবে অবশ্যই গর্বের। একজন ভারতীয় অমুসলমানের রচিত সংগীত কীভাবে বাংলাদেশের মতো আপাদমস্তক মোল্লাবাদী দেশের জাতীয় সংগীতের মর্যাদা পেলো, সেখানেই অনেকের কৌতূহল।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে ১৯০৫ সালের কার্জনের বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে কবিগুরুর 'আমার সোনার বাংলা' গানের আবির্ভাব। যদিও এটার কোনো পোক্ত দলিল-প্রমাণ পাওয়া যায়নি। রবীন্দ্র গবেষক প্রশান্ত কুমার পাল ১৯৯০ সালে তাঁর প্রকাশিত পুস্তক 'রবি জীবনী'তে লিখেছেন যে, এই গানটি প্রথমবার গাওয়া হয় কলকাতা টাউন হলের একটি সাহিত্য আসরে ১৯০৫ সালের ২৫ আগস্ট। লেখক ও গবেষক মহিউদ্দিন আহমেদ একটি আন্তর্জাতিক মিডিয়াকে সাক্ষাৎকারে জানান— ১৯৭১ সালের পূর্ববর্তী তথা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে 'আমাক সোনার বাংলা' গানটিকে রবীন্দ্রসংগীত হিসেবে অনেক অনুষ্ঠানে গাওয়া হতো। ১৯৭১ সালের ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হলে 'আমার সোনার বাংলা' গানটিকে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে গ্রহণ করার প্রথম আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়। তৎকালীন ছাত্রলিগের সভাপতি নুরে আলম সিদ্দিকী এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন জাতীয় সংগীত চয়নে 'সোনার বাংলা' ছাড়াও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'ধনধান্য

পুষ্পভরা' গানটিও অনেকের পছন্দের তালিকায় ছিল। তবে প্রধান দুটি কারণে এ গানটিকে নির্বাচিত করা সম্ভব হয়নি।

প্রথমত, গানটির কোথাও 'বাংলা' বা 'বাংলাদেশ' শব্দটি ছিল না, দ্বিতীয়ত, গানটির কোনো রেকর্ড সেই সময় পাওয়া যায়নি। সেই কারণে নাকচ হয়ে যায়। গানের উপযুক্ত রেকর্ড না থাকলে ঠিক কোন সুরে এবং গানের কতটুকু জাতীয় সংগীত হিসেবে ব্যবহার করা হবে তা নিয়ে সংশয় থেকে যায়। অবশেষে ১৯৭০ সালের জহির রায়হান পরিচালিত, 'জীবন থেকে নেওয়া' চলচ্চিত্রে 'আমার সোনার বাংলা' গানটির রেকর্ড থেকে যাওয়ায় গানটি জাতীয় সংগীতের মর্যাদায় এগিয়ে যায়। পূর্ব পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা পূর্ববর্তী প্রায় প্রত্যেকটি আন্দোলন, সভায় 'আমার সোনার বাংলা' গানটি বাজানো হয়েছে। ১৯৫০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদ বাহান্নর ভাষা বীরদের স্মরণে 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি'র পাশাপাশি 'আমার সোনার বাংলা' গানটিও পরিবেশিত হয়। বিভিন্ন বাধা, প্রতিকূলতা এভাবে পেরিয়ে ১৯৭২ সালের ১৩ জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম আনুষ্ঠানিক মন্ত্রীসভার বৈঠকে রবি ঠাকুরের 'আমার সেনার বাংলা' গানটির প্রথম দশ পঙ্ক্তিকে দেশটির জাতীয় সংগীতের মর্যাদা ও স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

কিন্তু গত বছর জেহাদি ছাত্র-জনতা অভুত্থানে হাসিনার শাসনের পতন হলে ইউনুস সরকার প্রথমে এই জাতীয় সংগীতের সংশোধন ও পরিবর্তন চেয়েছিল। অভিযোগ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধী ছিলেন এবং তাঁর জাতীয় সংগীত অখণ্ড বঙ্গকে উদ্দেশ্য করে লেখা। কবিগুরুর নামে আরও কুৎসা রটানো হয় যে তিনি প্রজানিপীড়ক, মুসলমান বিদ্বেষী, তাঁর পূর্বপুরুষরাও নাকি পতিতালয়ে যেতেন ইত্যাদি। ভেঙে ফেলা হয়েছিল কবিগুরুর ভাস্কর্য, জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাঁর সৃজনশীলতা। অথচ কবিগুরু ছিলেন নিরাকার ব্রহ্মে অনুরাগী। কবি জীবদ্দশায় স্পষ্ট করে বলেছিলেন— কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম আমার নয়। আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন, আমি পঙ্ক্তিহারা, আমি তোমাদেরই লোক। রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা'কে নিষিদ্ধ করতে ১৯৭৫ সালে খন্দকার মোস্তাক সরকার, পরবর্তীতে বিএনপির প্রবর্তক জিয়াউর রহমান সরকার, ২০০১ সালে খালেদা সরকার-সহ সবাই শুধুমাত্র জাতীয় সংগীতটি পরিবর্তনের লিখিত প্রস্তাবনা পর্যন্ত আনতে সক্ষম হয়েছিল। স্বাধীনতার ৫৩ বছর পরও একই বিতর্ক কিন্তু আবারও বুমেরাং হয়ে ফিরে গিয়েছে। স্বভাবতই অসমের শ্রীভূমি জেলার কংগ্রেস কার্যালয়ে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত ইস্যুতে হিমন্ত সরকার কঠোর তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। অসমের কংগ্রেস ব্রিগেড নিজেদের সিদ্ধান্তে অবিচল, উলটে তারা শাসক দলকে বাঙ্গালি তথা রবীন্দ্রনাথ বিরোধী আখ্যায়িত করছে। বরাক-সহ পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল, বাম, তথাকথিত বুদ্ধিজীবী সবাই সভা-সমিতি, পতাকা মিছিল, মোমবাতি মিছিল কোনোটাই বাদ দিচ্ছেন না ইসুটিতে বিজেপিকে বাঙ্গালি সংস্কৃতি বিরোধী হিসেবে ছবি বানানোর। বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ ইউনিটিও অসমের সোনার বাংলা ইস্যুতে নিজেদের সরিয়ে নিয়ে হাফ ছেড়ে বাঁচার চেষ্টায়। আজকে যারা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঢালে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের পৃষ্ঠপোষকতা করছেন, তাঁরাই কিছুদিন আগে করিমগঞ্জ জেলাকে রবিঠাকুরের দেওয়া 'শ্রীভূমি' নামে উৎসর্গ করায় তীব্র বিরোধিতায় রাজপথে নেমেছিলেন।

'শ্রীভূমি' কবিতার সঙ্গে 'আমার সোনার বাংলা' গানের যথেষ্ট যোগসূত্র রয়েছে। ঐতিহাসিকদের দাবি 'আমার সোনার বাংলা' গান কবি লিখেছিলেন 'বঙ্গভঙ্গে'র আবহে আর 'শ্রীভূমি' কবিতা লিখেছিলেন বঙ্গ থেকে তৎকালীন অবিভক্ত সিলেটকে বিচ্ছেদ করে অসমের সঙ্গে মিশিয়ে নেওয়ার পীড়াতে। কবি ১৯৯৯ সালের ৪ নভেম্বর সুরমা মেইল নামক ট্রেনে সিলেট যাওয়ার উদ্দেশে শিলং থেকে গৌহাটি হয়ে করিমগঞ্জে পৌঁছান। গোটা ভ্রমণকালে কবি সুরমা ভ্যালির সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে এবং এলাকাটিকে মূল বঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখায় বিষণ্ণতার কবিতাটি লিখেন—

'মমতাবিহীন কালস্রোতে
বাংলার রাষ্ট্রসীমা হতে
নির্বাসিতা তুমি
সুন্দরী শ্রীভূমি।'

যদিও কবিতার কোনো জায়গায় শুধু করিমগঞ্জকেই উদ্দেশ্য করে শ্রীভূমি কবিতার আবির্ভাব হয়েছে এমনটা দাবি করা যায় না, তবে সেই সুরমা ভ্যালির অবিভক্ত সিলেটের একমাত্র করিমগঞ্জই দেশ ভাগের পর ভারতের সঙ্গে যুক্ত আছে। তাই শতবর্ষ পর কবিগুরুর স্মৃতি ও সম্মানে অবশ্যই করিমগঞ্জের নাম শ্রীভূমি রাখাই যায় সেখানে আজকের রবীন্দ্রনাথ অনুরাগীদের বিরূপ হওয়ার যুক্তি ছিল না। 'আমার সোনার বাংলা' ইস্যুতে বিরোধীদের দাবি প্রধানমন্ত্রী মোদী ২০১৪ সালে পশ্চিমবঙ্গের দলীয় সভায় 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' উচ্চারণ করেছিলেন এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'ও পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক সভায় পশ্চিমবঙ্গকে 'সোনার বাংলা' গঠনের আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু ভারতের ২০১৪ সালের বাংলাদেশের সঙ্গে ২০২৫ সালের বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের বিস্তর ফারাক হয়ে গেছে।

এখন ইউনুস সরকার প্রকাশ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের চিকেন নেক নিয়ে হুমকি দিচ্ছে, পাকিস্তান ও চিনকে দেওয়া বিশেষ নকশায় বাংলাদেশ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শামিলের দুঃসাহসিকতা দেখাচ্ছে। ঘনঘন চীন-বাংলাদেশ-পাকিস্তান কূটনৈতিক বৈঠক বসছে, পাকিস্তানের নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের শীর্ষনেতারা ভারত-বাংলা সীমান্ত পরিদর্শনে আসছে, মোস্ট ওয়ান্টেড জাকির নায়েককে এরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দিকে বাংলাদেশের শকুন দৃষ্টি অনেক পুরানো। ১৯৫৭ সালের গাগমারী সম্মেলনে জামায়াতপন্থী মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাষানী ঘোষণা করেছিল, 'অসম আমার, পশ্চিমবঙ্গ আমার, ত্রিপুরাও আমার। এগুলো ভারতের কবল থেকে ছিনিয়ে না নেওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মানচিত্র কোনোদিন পূর্ণতা পাবে না।' তাই আজকের এই পরিস্থিতিতে যে কোনো রাজনৈতিক দলেরই অন্ততপক্ষে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে আনুগত্যতায় আরেকটু সংযমী হওয়া প্রয়োজন, অন্যথায় এটা পরোক্ষভাবে মহম্মদ ইউনুসের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দাবিকে আরও পাকা করবে। □

স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতীয় জনজাতিরা রেখেছে প্রখর প্রতিরোধের স্বাক্ষর

ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্বদানকারী জনজাতি সমাজ নতুন ভারত নির্মাণেও তাঁদের দায়িত্ব পালন করছেন।

অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায়

১৭৫৭ সালে সংঘটিত হয় পলাশীর যুদ্ধ। এই যুদ্ধে বঙ্গের নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত করে বাঙ্গলার শাসনক্ষমতা কবজা করে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। পলাশীর প্রান্তরে ভারতের স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয় বলে অনেক ইতিহাসবিদ মতপোষণ করলেও ঐতিহাসিক সত্য এর বিপরীত। ১৭৫৭-র পর অনেকটা সময় অতিবাহিত হয় ভারতের পূর্ব থেকে পশ্চিম, উত্তর থেকে দক্ষিণ— প্রতিটি প্রান্তে ইংরেজ শাসন বলবৎ হতে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ আগ্রাসন যত বেড়েছে, ততই দৃশ্যমান হয়েছে ইংরেজ অপশাসনের বিরুদ্ধে আপামর ভারতবাসী, বিশেষত জনজাতিদের ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর প্রতিবাদ-প্রতিরোধ। আবহমান কাল ধরে ভারতীয় জনজাতি সমাজ হলো ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। রামায়ণে নিষাদরাজ গুহককে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র আলিঙ্গন করেছেন। সুগ্রীবাদির সঙ্গে সখ্য স্থাপন করেছেন। শবরীর প্রতীক্ষা শেষ হয়েছে শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ দর্শনে। মহাভারতে উল্লেখিত হয়েছে জনজাতিদের বীরত্বের গাথা। গুরু দ্রোণের সম্মুখে তাঁর গুরুদক্ষিণা উপস্থাপন করেছেন একলব্য। স্মরণাতীত কাল থেকেই ভারত জননীর এই বীর সন্তানেরা হলো দেশমাতৃকার অঙ্গরক্ষক। অরণ্যবাসী, গিরিবাসী, গুহাবাসী এই সকল জনজাতি ভারতের জল, জমি, জঙ্গলের প্রকৃত সংরক্ষক।

ইসলামি শাসনে ভারত জুড়ে নেমে আসে এক ভয়ংকর অন্ধকার যুগ। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সাধারণ মানুষের সঙ্গে নির্যাতিত হতে থাকে জনজাতি সমাজ। ইংরেজ শাসনে বনবাসী মানুষের ওপর নেমে আসে অবর্ণনীয় অত্যাচার। ১৭৫৭-পরবর্তী পর্যায়ে ভারত জুড়ে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শুরু করে 'কলোনিয়াল এক্সপানশন' বা ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণ। শুরু হয় ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদের অবাধ লুণ্ঠন। বিভিন্ন রাজ্যের রাজপ্রাসাদ, কোষাগার লুঠ করে বিপুল ধনরত্ন সংগ্রহ করা ছাড়াও ব্রিটিশের

চোখ পড়ে ভারতের বনজ ও খনিজ সম্পদ-সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলির ওপর। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হয় জঙ্গল কাটাই। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য দখল করে নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং সমুদ্র বন্দর পর্যন্ত লুঠতরাজের সামগ্রী পরিবহণের জন্য রেলপথ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। ভারত থেকে ধনসম্পদ লুঠ করে জাহাজে বোঝাই করে ইংল্যান্ডে নিয়ে যাওয়া হতো। রেলপথ স্থাপনের ক্ষেত্রে দু'টি রেললাইনের মাঝে স্লিপারের প্রয়োজন হয়। কাঠ দিয়ে তৈরি করা হতো স্লিপার। দেশজুড়ে এই রেলপথ স্থাপনের জন্য প্রয়োজন হয় প্রচুর কাঠের। এর জন্য শুরু হয় অরণ্য নিধন পর্ব। ইংরেজ প্রশাসনের নির্দেশে শুরু হয় ব্যাপক বৃক্ষচ্ছেদন। এছাড়াও রাজস্ব সংগ্রহের জন্য ভারতবাসীর ওপর শুরু হয় সীমাহীন অত্যাচার। জল, জমি, জঙ্গলের ওপর থেকে অধিকার হারিয়ে অরণ্যবাসী জনজাতি সমাজ অনেক জায়গায় উদ্বাস্তু হয়ে পড়তে থাকে। অরণ্যাঞ্চল থেকে তাঁরা উচ্ছেদ হতে থাকে। একটি অরণ্য থেকে তাঁরা উচ্ছেদ হয়ে অন্য অরণ্যে আশ্রয় নিলেও সেখানেও তাঁদের ওপর নেমে আসে ব্রিটিশ শাসকদের চরম নির্যাতন। জাতিবিদ্বেষী, বর্ণবিদ্বেষী ব্রিটিশ শাসক এবং তাদের মোসাহেবদের পক্ষ থেকে চাপিয়ে দেওয়া অপশাসনের বিরুদ্ধে ১৭৫৭ সালের পর থেকেই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে ভারতীয় জনজাতি সমাজ। বিভিন্ন সময়কালে বিভিন্ন জনজাতি সম্প্রদায় ব্রিটিশ শাসকের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে গড়ে তুলেছে সশস্ত্র প্রতিরোধ। আবহমানকাল ধরে প্রকৃতির কোলে জন্ম নেওয়া থেকে বেড়ে ওঠা জনজাতিদের জন্মসিদ্ধ অধিকার ছিল ভারতের বনভূমির ওপর। ভারতে ব্রিটিশ শাসন বলবৎ হলে বনভূমির ওপর তাঁদের স্বাভাবিক অধিকার হারায় জনজাতিরা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রকোপে তাঁদের ওপর চলতে থাকা অর্থনৈতিক শোষণ মাত্রাছাড়া হলে পরাধীন ভারতের ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে (বর্তমান বিহার, ঝাড়খণ্ড ও বঙ্গপ্রদেশের পশ্চিমাঞ্চল) ১৭৭১ সালে প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করে সাঁওতালরা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ব্রিটিশ শাসনে ১৭৭০ সালে বঙ্গপ্রদেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ১৭৮৪ সাল পর্যন্ত এই বিদ্রোহের রেশ ছড়িয়ে পড়ে সাঁওতাল পরগনা জুড়ে। এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন তিলকা মাঝি। জনজাতি সমাজ তাঁকে 'মাঝি বাবা' অভিধায় ভূষিত করে। তিনি হলেন ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামী যিনি সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলা ছাড়াও ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে স্থানীয় জনজাতিদের সংগঠিত করেছিলেন। জমি লুঠ, জল-জমি-জঙ্গলের অধিকার থেকে জনজাতিদের বঞ্চিত করা এবং বলপূর্বক খাজনা আদায়ের নির্মম পন্থা অবলম্বন করে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। তার বিরুদ্ধে তিলকা মাঝির নেতৃত্বে শুরু হয় 'খেরওয়াড় বিদ্রোহ'। ১৭৭৮ সালে ১৩০০ জন সাঁওতাল বিদ্রোহীকে নিয়ে ঝটিকা আক্রমণ শানিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রামগড় ব্যাটেলিয়নের ক্যান্টনমেন্ট কবজা করে নেন এবং কোম্পানির ট্রেজারি অধিকার করে সেই অর্থ জনগণের মধ্যে বিতরণ করেন। ১৭৮৪ সালে তাঁর ছোঁড়া তিরে ভাগলপুর ও রাজমহলের ইংরেজ কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট অগাস্টাস ক্লিভল্যান্ড নিহত হন। এরপর তিলকপুরের জঙ্গলে তিলকা মাঝি ও তাঁর সঙ্গীদের ঘেরাও করে ইংরেজ সেনাবাহিনী। একটানা অনেক দিন প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পর আহত ও রক্তাক্ত অবস্থায় ধরা পড়েন তিলকা মাঝি। বিদ্রোহের শাস্তিস্বরূপ তাঁকে ছুটন্ত ঘোড়ার পেছনে বেঁধে দেওয়া হয়। এই নৃশংস পদ্ধতিতেও তাঁর মৃত্যু না হলে তাঁকে প্রকাশ্যে ফাঁসি দেওয়া হয় ভাগলপুর শহরে। ভারতজননীর বীর সন্তান তিলকা মাঝি হলেন ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম বীরগতিপ্রাপ্ত সৈনিক।

ছোটনাগপুর অঞ্চলের সিংভূম, মানভূমে ব্রিটিশদের শোষণ, রাজস্ব বৃদ্ধি এবং পরম্পরাগত জীবিকা ও জীবনযাত্রায় ব্রিটিশদের হস্তক্ষেপের কারণে ১৮৩১-৩২ সালে সংঘটিত হয় কোলবিদ্রোহ। বুধু ভগত, জোয়া ভগত, সুই মুণ্ডা, বিন্দ্রাই মানকি, সিংরাই মানকি প্রমুখ বীর জনজাতি যোদ্ধা কোল জনজাতিদের এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন। বিদ্রোহীরা ইংরেজ শাসকদের দুর্গ ও প্রাসাদ দখল করে। কোল জনজাতি সম্প্রদায়ের অসংখ্য মানুষকে হত্যা করে ব্রিটিশরা নির্মমভাবে এই বিদ্রোহ দমন করে। কিন্তু এই বিদ্রোহ ভবিষ্যতে জনজাতি সমাজের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ধারাটিকে প্রভূত শক্তি দান করে।

১৭৬৬ থেকে ১৮৩৪ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বিক্ষিপ্ত ভাবে বঙ্গভূমিতে সংঘটিত হয় চূয়াড় বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহ ছিল ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের অন্যতম বৃহৎ কৃষক বিদ্রোহ। বঙ্গভূমির জঙ্গলমহল অঞ্চলের (মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, সিংভূম, মানভূম ও ধলভূমের) ভূমিজ অধিবাসীরা স্থানীয় জমিদারদের অধীনে পাইকের কাজ করতেন। কাজের বিনিময়ে ওই অঞ্চলের জায়গা-জমির অধিকার তাঁরা ভোগ করতেন। চাষাবাদ, পশুপালন এবং পশুশিকারের সঙ্গে তাঁরা জড়িত থাকলেও তাঁরা স্বভাবে ছিলেন ক্ষত্রিয়, যুদ্ধবিগ্রহে তাঁরা ছিলেন দক্ষ। বঙ্গে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই অঞ্চলের জমির ওপর চড়া ভূমিরাজস্ব ধার্য করার ফলে স্থানীয় জমিদারদের সঙ্গে এই পাইক, বরকন্দাজরাও জঙ্গলমহল জুড়ে বিদ্রোহ করেন। অন্ত্যজ জনজাতিদের এই কৃষক বিদ্রোহকে ব্রিটিশরা ঘৃণাভরে 'চূয়াড় বিদ্রোহ' নাম দেয়। ১৭৬৬ সালে ঘাটশিলায় ধলভূমের ভূমিজ রাজা জগন্নাথ সিংহ প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। রানি শিরোমণির নেতৃত্বে সংঘটিত এই বিদ্রোহের ইতিহাস চিরস্মরণীয়। এই বিদ্রোহের নেত্রী রানি শিরোমণিকে ১৭৯৯ সালে বন্দি করে ইংরেজ প্রশাসন। ১৮৩২-৩৪ সালে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে গঙ্গা নারায়ণ সিংহের নেতৃত্বে সংঘটিত ভূমিজ বিদ্রোহও চূয়াড় বিদ্রোহের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়। কোম্পানির সেনাদল নির্মম অত্যাচার করে এই বিদ্রোহ দমন করেছিল। নৃশংসভাবে বিদ্রোহীদের হত্যা করে তারা। গাছের ডালে বিদ্রোহীদের ফাঁসি দিয়ে তাঁদের মৃতদেহ ঝুলিয়ে রেখে ত্রাস সৃষ্টি করা হয় গ্রামের সাধারণ মানুষের মধ্যে।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের আগে ১৮৫৫ সালে ছোটনাগপুর মালভূমির বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সিধু মুর্মু, কানু মুর্মুর নেতৃত্বে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহে ফেটে পড়ে সাঁওতালরা। ভারতের ইতিহাসে এই ঘটনা 'হুল বিদ্রোহ' বা 'সাঁওতাল বিদ্রোহ'

স্বাভিমানী সমাজের পথিকৃৎ

গত ৩০ অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডলের বৈঠক জব্বলপুরে অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে 'ধরতী আবা ভগবান বীরসা মুণ্ডার ১৫০তম জন্মবর্ষ শীর্ষক নিম্নলিখিত বক্তব্যটি প্রকাশিত হয়।

ভারতের গৌরবময় স্বাধীনতা সংগ্রামে জনজাতি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর ও যোদ্ধাদের মধ্যে ভগবান বীরসা মুণ্ডার একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। ১৮৭৫ সালের ১৫ নভেম্বর উলীহাতু (ঝাড়খণ্ড)-তে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। এবছর তাঁর ১৫০তন জন্মবর্ষ। জনজাতিদের ওপর ব্রিটিশ প্রশাসনের অত্যাচারের কারণে তাঁর বাবা উলীহাতু থেকে বম্বা গ্রামে এসে বসবাস শুরু করেন। ১০ বছর বয়সে বীরসা চাইবাসা মিশনারি স্কুলে ভর্তি হন। সেখানে জনজাতি ছাত্রদের ধর্মীয় পরম্পরাকে উপেক্ষা করে খ্রিস্টমতে ধর্মান্তরণের চক্রান্ত তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। ধর্মান্তরণের ফলে একজন ব্যক্তির কেবলমাত্র ধর্মীয় বিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক চেতনাই নষ্ট হয় না, ধীরে ধীরে তার সমাজের প্রতি স্বাভিমানও নষ্ট করে ফেলে। মাত্র ১৫ বছর বয়সে খ্রিস্টান মিশনারিদের এই চক্রান্ত বুঝতে পেরে তিনি সমাজ জাগরণের মাধ্যমে নিজেদের ধর্মীয় স্বাভিমান ও ঐতিহ্য রক্ষার জন্য সংগ্রাম শুরু করেন।

মাত্র ২৫ বছর বয়সে ভগবান বীরসা মুণ্ডা বিকট পরিস্থিতিতে নিমজ্জিত তাঁর সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে এক সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণের তরঙ্গ সৃষ্টি করেছিলেন । প্রশাসনিক সংস্কারের নামে ইংরেজ সরকার জঙ্গল অধিগ্রহণ, তাদের জমির অধিকার কেড়ে নেওয়া এবং জোর করে শ্রমনীতি বাস্তবায়নের বিরুদ্ধে ভগবান বীরসা মুণ্ডা এক সর্বাত্মক জনআন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর সেই আন্দোলনের রণহুংকার ছিল 'আবুয়া দিশুম, আবুয়া রাজ' অর্থাৎ 'আমাদের দেশ, আমাদের সরকার'। এই রণহুংকার জনজাতি যুবসমাজের মনে এক প্রেরণাদায়ক মন্ত্র হয়ে ওঠে, যা হাজার হাজার মানুষের মনে তাদের স্বধর্ম ও স্বাভিমান রক্ষার জন্য জীবন বলিদান দিতে অনুপ্রাণিত করে। জনজাতিদের অধিকার, তাঁদের বিশ্বাস, ঐতিহ্য ও স্বধর্ম রক্ষার জন্য ভগবান বীরসা মুণ্ডা অসংখ্য আন্দোলন ও যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। নিজেদের স্বাভিমান ও স্বধর্ম রক্ষার জন্য লড়াই করতে করতে মাত্র ২৫ বছর বয়সে তিনি ব্রিটিশ পুলিশের হাতে বন্দি হন এবং সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে কারাগারে তাঁর মৃত্যু হয়।

সমাজের প্রতি তাঁর প্রেম ও বলিদানের কারণে সমগ্র জনজাতি সমাজ তাঁকে দেবতার আসনে বসিয়ে 'ধরতী আবা ভগবান বীরসা মুণ্ডা' বলে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। ভারত সরকার সংসদ ভবনে তাঁর প্রতিমূর্তি স্থাপন করে তাঁকে যোগ্য সম্মান প্রদান করেছে। প্রতি বছর ১৫ নভেম্বর তাঁর জন্মদিনটিকে 'জনজাতি গৌরব দিবস' রূপে পালন করা হয়। তাঁর বলিদান দেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে জনজাতিদের মহান অবদানের উদাহরণ হয়ে সমগ্র জাতির কাছে প্রেরণাপ্রবাহ হয়ে রয়েছে। ধর্মীয় বিশ্বাস, সাংস্কৃতিক পরম্পরার প্রতি বিশ্বাস, প্রখর স্বাভিমানবোধ এবং জনজাতি সমাজের অস্মিতা রক্ষায় ভগবান বীরসা মুণ্ডার জীবন ও বাণী আজও সমান প্রাসঙ্গিক।

বর্তমান সময়ে বিচ্ছিন্নতবাদী মতাদর্শ-জারিত লোকেরা ভারতের জনজাতি সমাজের মানুষদের নিয়ে এক ভ্রান্ত ও মিথ্যা প্রচারের প্রয়াস করে চলেছে। এরকম সময়ে ভগবান বীরসা মুণ্ডার ধর্মীয় ও বীরত্বমূলক ঘটনাগুলি এইসব ভ্রান্তি দূর করে সমগ্র সমাজে স্বাভিমান, আত্মবিশ্বাস ও একাত্মতাকে দৃঢ় করতে সহায়ক হবে। ভগবান বীরসা মুণ্ডার ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র সমাকে আবেদন জানাচ্ছে যে, ভগবান বীরসা মুণ্ডার জীবন, কর্ম ও চিন্তাভাবনাগুলি গ্রহণ করে 'স্ব-বোধ'-যুক্ত, সংগঠিত ও স্বাভিমানী সমাজ নির্মাণে সকলেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করুন।

নামে পরিচিত। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর আদায়-সহ অকথ্য নির্যাতন, স্থানীয় ভূস্বামী ও সুদখোর মহাজনদের অত্যাচার এবং এই সরকার-সাহুকার-জমিন্দার-এর অশুভ চক্রের শোষণতন্ত্রের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে স্থানীয় জনজাতি সমাজ। ১৮৫৫ সালের ৩০ জুন এই বিদ্রোহের সূত্রপাত হওয়ার কারণে স্বাধীন ভারতে এই দিনটিকে 'হুল দিবস' হিসেবে উদ্‌যাপন করা হয়। সিধু-কানুদের ঘোষিত এই বিদ্রোহে তাঁদের সঙ্গী ছিলেন— চাঁদ, ভৈরব, ফুলো, ঝানো প্রমুখ নেতা-নেত্রী। বিদ্রোহীদের প্রবল প্রতিরোধে ইংরেজ সেনা পালিয়ে গিয়ে পাকুড় দুর্গে আশ্রয় নেয়। এরপর ছোটনাগপুর অঞ্চল জুড়ে মার্শাল ল' জারি করে বীভৎস অত্যাচার শুরু করে ব্রিটিশ প্রশাসন এবং কয়েক হাজার সাঁওতাল জনজাতির মানুষকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। সিধু-কানু ইংরেজ সেনার হাতে ধরা পড়েন। তাঁদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। প্রশাসনিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনজাতি সমাজের এই তীব্র আন্দোলন ও প্রতিরোধস্পৃহা দেখে শঙ্কিত হয় ব্রিটিশ প্রশাসন। শোষণতন্ত্রের হাত থেকে ভূমিপুত্র জনজাতিদের আংশিকভাবে সুরক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে তারা 'সাঁওতাল পরগনা টেন্যান্সি অ্যাক্ট' নামক একটি আইন প্রণয়ন করে। অধিকার রক্ষার স্বার্থে সংঘটিত জনজাতি সমাজের সংগ্রামের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে প্রতি বছর ৩০ জুন দিনটি 'হুল দিবস' হিসেবে উদ্‌যাপিত হয়।

এরপরেও অব্যাহত থাকে জনজাতি সমাজের ওপর ব্রিটিশ সরকার এবং বহিরাগত কুসীদজীবী, মহাজনদের শোষণ, ভূমি ও বন অধিকার হরণ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবিচার। এর বিরুদ্ধে ১৮৯৯-১৯০০ সালে রাঁচির দক্ষিণ দিকে, ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে ভগবান বীরসা মুণ্ডার নেতৃত্বে ঘোষিত হয়— 'উলগুলান'। মুণ্ডা বিদ্রোহকে 'উলগুলান' বলা হয়। এর অর্থ 'বিপজ্জনক অবস্থা' বা 'বিদ্রোহ'। ১৮৭৫ সালের ১৫ নভেম্বর তৎকালীন ব্রিটিশ প্রেসিডেন্সির রাঁচি জেলায় (অধুনা ঝাড়খণ্ডের খুন্তি জেলায়) উলিহাতু গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন বীরসা মুণ্ডা। ব্রিটিশ সরকার, স্থানীয় জমিদার, মহাজন ও খ্রিস্টান মিশনারিদের থেকে জনজাতিদের বাসভূমি ও বনাঞ্চলের ওপর অধিকার, তাঁদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এবং সাংস্কৃতিক স্বাধিকার ছিনিয়ে নিয়ে স্বশাসন (অবুয়া দিশম, অবুয়া রাজ) প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মরণপণ সংগ্রামে ব্রতী হন ভগবান বীরসা মুণ্ডা। পূর্ব ও মধ্য ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল (বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ওড়িশা) জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে এই বিদ্রোহ। ১৮৯৫ সালে ভগবান বীরসা মুণ্ডাকে গ্রেপ্তার করে ব্রিটিশ সরকার। তাঁর দু'বছর কারাদণ্ড হয়। কারামুক্তির পর ১৮৯৮ সালে তিনি মুণ্ডা জনজাতি সমাজের সঙ্গে স্থানীয় মন্দিরগুলির সংযোগস্থাপনে উদ্যোগী হন। ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির মূলধারা থেকে জনজাতি সমাজকে বিচ্ছিন্ন করতে সক্রিয় খ্রিস্টান মিশনারিদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক লড়াই শুরু করেন ভগবান বীরসা মুণ্ডা। ১৮৯৯ সালের ডিসেম্বরে তিনি জনজাতির সম্প্রদায়ের প্রায় ৭০০০ মানুষকে সংগঠিত করে 'উলগুলান'-এর ডাক দেন এবং জমিদার, জায়গিরদার, ঠিকাদারদের শাসন, খ্রিস্টান মিশনারিদের দ্বারা ধর্মান্তরণ ইত্যাদি শেষ করার সংকল্পগ্রহণ করেন। তিনি জানান যে, ব্রিটিশ নিধন হলো তাঁর মূল লক্ষ্য, জনজাতি সম্প্রদায়ের কোনো মানুষের ক্ষতি তাঁরা করবেন না। ভগবান বীরসা মুণ্ডার নেতৃত্বে থানাগুলির ওপর আক্রমণ চলতে থাকে। তাঁকে ধরার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করে ব্রিটিশ সরকার। ১৯০০ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি চক্রধরপুরের জামকোপাইয়ের জঙ্গল থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে ব্রিটিশ পুলিশ। তাঁর সঙ্গে ধরা পড়া জনজাতি যোদ্ধাদের ফাঁসির সাজা-সহ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের সাজা ঘোষণা হয়। কারান্তরালে প্রবল নির্যাতনের কারণে ১৯০০ সালের ৯ জুন ভগবান বীরসা মুণ্ডা শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁকে 'ধরতী আবা' অভিধায় ভূষিত করে ভারতীয় জনজাতি সমাজ। তাঁর মরণপণ আন্দোলন ও সংগ্রামের ফলে ১৯০৮ সালে 'ছোটনাগপুর টেন্যান্সি অ্যাক্ট' প্রণয়নে বাধ্য হয় ব্রিটিশ প্রশাসন, যা 'খুন্তকাট্টি' বা স্থানীয় জনজাতিদের ভূমি অধিকারকে স্বীকৃতিদান করে এবং বেথ বেগারি প্রথা (জোরপূর্বক শ্রম) বিলুপ্ত করে। ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০২১ সাল থেকে '১৫ নভেম্বর' অর্থাৎ ভগবান বীরসা মুণ্ডার জন্মদিন— 'জনজাতীয় গৌরব দিবস' হিসেবে উদ্‌যাপিত হচ্ছে। ভারতজননীর মহান সন্তান ভগবান বীরসা মুণ্ডার জন্মসার্ধশতবর্ষ এই বছর দেশজুড়ে উদ্‌যাপিত হচ্ছে। তাঁর বীরত্ব, তাঁর আত্মবলিদান স্মরণ করাই হোক ভারতবাসীর ধ্যেয় ও লক্ষ্য।

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার জনজাতি উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকার তার উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রকের মাধ্যমে নীতি প্রণয়ণ ও পরিকল্পনায় যিক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধি, সামাজিক সুরক্ষা প্রদান এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার সুলভ করেছে। জনজাতিদের জন্য বিভিন্ন ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার সুলভ করেছে। জনজাতিদের জন্য বিভিন্ন আর্থিক সহায়তা প্রকল্প ও বৃদ্ধির ব্যবস্থা করেছে। সামাজিক সুরক্ষার জন্য অটল পেনশন যোজনা চালু করেছে। গত একাদশকে কয়েক কোটি জনজাতি সমাজের মানুষকে দরিদ্র সীমার বাইরে এনেছে। বর্তমানে জনজাতি কল্যাণের জন্য নীতিনির্ধারণ ও বাস্তবায়নের জন্য নীতি আয়োগ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বীরগতিপ্রাপ্ত জনজাতি যোদ্ধাদের বীরগাথা স্মরণ, শ্রদ্ধাজ্ঞাপন এবং জনজাতি সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির লক্ষ্যে বালাসাহেব দেশপাণ্ডের নেতৃত্বে ১৯৫২ সাল থেকে শুরু হয় 'বনবাসী কল্যাণ আশ্রম'-এর কাজ। অশিক্ষা ও দারিদ্র্যের কারণে ধর্মান্তরণের শিকার জনজাতিরা যাতে ভারতীয় জনজীবনের মূলধারা থেকে কোনোভাবে বিচ্ছিন্ন না হয়ে পড়ে— সেই বিষয়টি নিশ্চিত করতে কল্যাণ আশ্রমের কার্যকর্তাদের আত্মত্যাগও বিশেষ স্মরণীয়। প্রতিষ্ঠার দিন থেকে এখনও পর্যন্ত তাঁদের দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে জনজাতি সমাজের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে এবং হচ্ছে। আগামীদিনে অনেক কাজ বাকি।

ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্বদানকারী জনজাতি সমাজ নতুন ভারত নির্মাণেও তাঁদের দায়িত্ব পালন করছেন। ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু। জনজাতি সমাজের আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়ন আগামীদিনে 'বিকশিত ভারত' নির্মাণে সহায়ক হবে। □

বিহারের জনগণ ভাতাজীবী হয়ে বাঁচতে চায়নি

২০২৫ সালে বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল সমগ্র ভারতবর্ষের চোখ খুলে দিয়েছে। এই নির্বাচনে বিহারের জনগণ বেছে নিয়েছে উন্নত বিহারের স্বপ্ন ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক শক্তিকে। তাঁরা ভাতাজীবী হয়ে বাঁচতে চায়নি। একসময় দেশজুড়ে পরিযায়ী শ্রমিক সরবরাহ করত বিহার। আমাদের বঙ্গে অভিভাবকরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে ছেলেমেয়েদের আইএএস, আইপিএস তৈরি করত। আর এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ উল্টো। গত এক দশকে অনেক উন্নতি হয়েছে বিহারে। ২০২৫-এর বিহার বিধানসভা নির্বাচনের এই ফলাফলের পর পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে কোনো বিহারীকে কারুর আর টিটকিরি করা উচিত নয়। কোনো কাজে ভুল হলে বিহারী বুদ্ধি বলে তাদের ছোটো করা উচিত নয়। কারণ তাঁদের রাজ্যে চুরি-দুর্নীতিরাজ বা ভাতার কাছে তাঁরা মাথানত করেনি। পথেঘাটে বিহারীরা একে অপরকে দেখলে 'জয় বিহার' বলে সম্বোধন করার প্রথা চালু করে দিয়েছে।

বিহার একসময় তাচ্ছিল্যের পাত্র ছিল। ভগবান বুদ্ধ, চাণক্য, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের এই ভূমি নানাকারণে তাচ্ছিল্যের শিকার হয়। ১৯৯০ সালে লালুপ্রসাদ যাদব বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হলে রাজ্য জুড়ে কায়েম হয় জঙ্গলরাজ। চরম দুর্নীতিগ্রস্ত লালুপ্রসাদের মেয়ে ডাক্তারি এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম স্থানাধিকার করে দিল্লিতে ডাক্তারি পড়তে গেলে ফেল করেন। এই ঘটনাটি বুঝিয়ে দেয় সেই সময় বিহারের শিক্ষাব্যবস্থার কী শোচনীয় হাল হয়েছিল! শিক্ষাহীন বিহারে ছিল জাতপাতের রাজনীতি, মাফিয়ারাজ। সাধারণ মানুষকে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রেখে, জাতপাতের লড়াইয়ে তাঁদের লড়িয়ে দেওয়া হতো একে অপরের বিরুদ্ধে। অন্য রাজ্যের লোকজন বিহারের চাকরির পরীক্ষা দিতে যেতে ভয় পেত। পরীক্ষা দিতে বিহারে গেলে অন্য রাজ্যের চাকরিপ্রার্থীদের ট্রেন থেকে নামতে দেওয়া হতো না; স্টেশনের বাইরে তাঁরা বেরোতে পারত না। বিহারের নির্বাচনী ইতিহাসে সর্বোচ্চ ভোটদান সংঘটিত হয়েছে এবারের বিধানসভা নির্বাচনে। প্রায় ৬৭ শতাংশ মানুষ এবার ভোটদান করেছেন। সম্পূর্ণ ভোটপর্ব হয়েছে শান্তিপূর্ণ। গোটা রাজ্যে কোথাও গুলি চালনা, বোমা বিস্ফোরণ বা লাঠিচার্জের ঘটনা ঘটেনি। এমনকী কোনো বুথে পুনর্নির্বাচন পর্যন্ত হয়নি। কয়েক মাস আগে বিহারে এসআইআর সংঘটিত হলেও বিধানসভা নির্বাচনে বিরোধী দলের কোনো ভোটারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ তোলা হয়নি। একজন মুসলমানও কোথাও বলেনি যে, তাদের ভোটদানে বাধা দেওয়া হচ্ছে। এবার নিজেদের, অর্থাৎ গর্বিত বাঙ্গালিদের দিকে একটু তাকাই। আমরাও ভিড় করি, তবে মিটিং-মিছিলে, মেলা-খেলা-উৎসবে। চাকরি, ব্যবসার প্রতি আমাদের আগ্রহ কম। ক্লাব, রাজনীতি, সিন্ডিকেট ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত থাকে পশ্চিমবঙ্গবাসীর একটা বড়ো অংশ। নতুন প্রজন্ম ফ্রি ইন্টারনেট পেলে ফেসবুক করে, রিল বানায়, পাবজি খেলে, সিনেমা দেখে, গান শোনে, ইনস্টাগ্রামে ছবি আপলোড, শেয়ার ইত্যাদি করে। দিনের শেষে বিহারিদের উদ্দেশ্যে অনেকেই বলে ওরা খোট্টা, গুটখাখোর, এই বিহারিগুলো আমাদের সব দখল করে নিল ইত্যাদি। এরপর ভিড় করে বেকার ভাতার লাইনে। ফলে যা হওয়ার তাই হয়। বিশাল দুর্নীতি ধরা পড়লেও ১০০ দিনের কাজে সেরা হয় পশ্চিমবঙ্গ, আর বিহারের ছেলে-মেয়েরা আইএএস, আইপিএস হয়।

একটা পিছিয়ে পড়া রাজ্য নিজের চেষ্টায় এগিয়ে চলেছে, উঠে দাঁড়াচ্ছে, প্রতিষ্ঠার জন্য লড়ে যাচ্ছে। সবারই সব ক্ষেত্রে মানসিকতার পরিবর্তন দরকার। তবেই ভিক্ষা, ভাতা ইত্যাদি দিয়ে, দেশবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত করে, জাতপাতে বিভক্ত করে সাধারণ মানুষকে মাতিয়ে রাখা যাবে না। এই বিষয়টি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে বিহারের সাম্প্রতিক নির্বাচন। এই নির্বাচনে সংসদীয় গণতন্ত্রের জয় হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের শাসক সিপিএম, তৃণমূলের মতো রাজনৈতিক দলগুলি যা করতে পারেনি বা করতে চায়নি, সেটা করে দেখিয়েছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। সেটা হলো—হিংসা, হানাহানি, রক্তক্ষয় ছাড়া একটা নির্বাচন।

'দুর্নীতি যখন হয়ে ওঠে সংস্কৃতি, সততা ও যোগ্যতা, তখন পায় না স্বীকৃতি।' একদিন সারা দেশ হাসতো বিহারকে নিয়ে, বিশেষ করে রাজনৈতিক জোকার লালুপ্রসাদকে নিয়ে। ২০০৫ সাল থেকে বিহারের নতুন জাগরণ শুরু হলো নীতীশ কুমারের হাত ধরে। ক্ষমতায় এসে পরীক্ষায় টোকাটুকি বন্ধ করলেন তিনি। পাশের হার অনেক কমে গেল। তিনি চুপ রইলেন। সমালোচনা হলো রাজ্য ও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। তিনি জোর দিলেন উৎকর্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার ওপর। শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কারের ফলে ভালো ভালো ছেলে-মেয়ে তৈরি হয় বিহারে। 'মদ' এমনই একটি জিনিস যা যুবসমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, সংসারে অশান্তি টেনে আনে। সব সরকারেরই প্রচুর রাজস্ব আসে মদ বিক্রি থেকে। কিন্তু নীতীশজী তাঁর রাজ্যে সেই মদ বিক্রি বন্ধ করলেন। রাজস্ব সংগ্রহ কম হলেও মাদকাসক্তির হাত থেকে রাজ্যকে বাঁচানোর জন্য তিনি এহেন পদক্ষেপ নিলেন। এই সিদ্ধান্তে একটা সদর্থক বার্তা গেল যুবসমাজের মধ্যে। হয়তো তখন থেকেই যুবসমাজ ও মহিলা সমাজ বুঝতে পেরেছিল যে, নীতীশজীই পারেন বিহারকে উন্নতির পথ দেখাতে এবং শিক্ষা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরও বেশি উন্নয়ন করতে। তাঁরা আশা করেন যে, নীতীশজী হলেন এমন নেতা, যাঁর নেতৃত্বে বিহারে সব দিক থেকে নবজাগরণ ঘটতে পারে। অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষ ও রণবীর সেনার লড়াই বন্ধ করলেন নীতীশ। বন্ধ করলেন প্রদেশ জুড়ে মাফিয়াদের নেতৃত্বে পরিচালিত রক্তপাত। কড়া হাতে মাফিয়ারাজ দমন ছাড়াও, বিহারের জাতপাতের রাজনীতিতে লাগাম পড়ালেন। ফলে মানসিকতা পরিবর্তন হলো বিহারের। হাত পেতে ভিক্ষা বা গা জোয়ারি করে টাকা আদায় করে নয়, নিজস্ব যোগ্যতায় বিহারবাসী অর্জন করতে শিখল সর্বভারতীয় চাকরি।

অনেকদিন আগে একটা খবর ভাইরাল হয়েছিল যে, বিহারের সাসারাম প্ল্যাটফর্মে প্রতিদিন বিকেলে জড়ো হয় কয়েকশো ছেলে-মেয়ে। গ্রামে বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেটের সুবিধা ছিল না থাকার মতো। প্ল্যাটফর্মের আলো এবং স্টেশনের ওয়াই-ফাইয়ের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তাঁরা শিখত জিকে (জেনারেল নলেজ বা সাধারণ জ্ঞান), কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, অঙ্ক, ইংরেজি। লক্ষ্য একটাই—

ফ ঃ ৩

সরকারি চাকরি পেতে হবে। সারা ভারত অবাক হয়ে দেখেছিল সেই ছবি— চাকরি পাওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এক যুবসমাজ।

—**রঘুনাথ রায়,**
লেকটাউন, কলকাতা-৭০০০৪৮।

'পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালি হিন্দুদের রক্ষা করবার দায় কার?'

স্বস্তিকা পত্রিকার গত ৩ নভেম্বর সংখ্যায় লেখক শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী এমন এক প্রশ্ন তুলেছেন, যা আজ প্রতিটি সচেতন নাগরিকের মনের কথা। দীর্ঘদিন ধরে এই রাজ্যের হিন্দুসমাজ নিঃস্বার্থভাবে রাষ্ট্রবাদী রাজনীতিকে সমর্থন জানিয়ে এসেছে। তাঁরা ভেবেছে কেন্দ্রে যে সরকার বসে রয়েছে, তারা তাঁদের পাশে থাকবে। যখন ঘর জ্বলবে, তখন দিল্লি থেকে এক আলোকরশ্মি এসে রক্ষা করবে পশ্চিমবঙ্গবাসীকে। কিন্তু সেই আলো এখন কোথায়? উল্টে এখানে চোখে পড়ছে আক্রমণের রাজনীতি ও আতঙ্কের বাস্তবতা। যে রাজ্যে সাংসদ আক্রান্ত হন, বিধায়কের গাড়ি ভাঙা হয়, সাধারণ রাজনৈতিক কর্মীকে রাস্তায় পিটিয়ে মারা হয়— সেই রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা কোথায়? প্রশাসন কি শুধুই নির্বাক দর্শক? যেখানে রাষ্ট্রবাদী রাজনৈতিক দলের সর্বভারতীয় সভাপতি পর্যন্ত আক্রান্ত হন, সেই রাজ্যের অবস্থা যে অরাজকতার চূড়ান্ত রূপ ধারণ করেছে, তা নিয়ে কারও সন্দেহ থাকা উচিত নয়। লেখক শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী লিখেছেন, 'যে রাজ্যে বিরোধী রাজনীতি করা মানেই জীবনের ঝুঁকি, সেই রাজ্যে গণতন্ত্রের অর্থ শুধুই ভোট নয়, এটি এখন আত্মরক্ষার সংগ্রাম।' এই রাজ্যে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা এখন জনজীবনের অংশ, প্রশাসনিক নির্লিপ্ততা এখন অভ্যাসে পর্যবসিত, আর হিন্দু নামধারী মানুষ এখানে আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে— নিজস্ব ধর্ম, সংস্কৃতি, উৎসব, এমনকী নিজের ভাষার মর্যাদা রক্ষা নিয়েও তাঁরা রীতিমতো শঙ্কিত।

অথচ এতকিছুর পরও নীরব কেন্দ্র এবং এই কারণে প্রশ্নের মুখে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। যে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা ধ্বংসের মুখে, যেখানে সংবিধানের মৌলিক অধিকার প্রতিদিন লঙ্ঘিত হচ্ছে, সেখানে কেন্দ্রের দায়িত্ব কি শুধু পর্যবেক্ষকের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবকিছু দেখা? ৩৫৬ ধারা ভারতীয় সংবিধানের অন্তর্গত একটি প্রশাসনিক অস্ত্র, যা কোনো রাজ্যে সাংবিধানিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়লে প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু প্রশ্ন হলো— সেই ধারা প্রয়োগের ক্ষেত্রে যদি এই পরিস্থিতিও যথেষ্ট না হয়, তবে সেই ধারার প্রয়োজনীয় ঠিক কোথায়? শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী তাঁর লেখায় কটাক্ষ করে লিখেছেন, 'নীরবতা কখনও কখনও অপরাধের চেয়েও ভয়াবহ। কারণ নীরবতা অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়।' তাই পূর্ববঙ্গের মতো 'হিন্দুশূন্য' পশ্চিমবঙ্গের ছায়া যেন ভবিষ্যতের আশঙ্কা হিসেবে ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠছে। আজ বঙ্গবাসীর অন্তরে একটাই প্রশ্ন ঘুরছে— হিন্দুরা কী তাঁদের জন্মভূমিতেই সংখ্যালঘু হয়ে যাবে? যেভাবে হিন্দু পরিবারগুলি ক্রমে রাজ্যের সীমান্তবর্তী জেলাগুলি থেকে সরে যেতে বাধ্য হচ্ছে, যেভাবে জনবিন্যাস বদলে যাচ্ছে, তাতে আগামী দশকে পশ্চিমবঙ্গ প্রায় হিন্দুশূন্য হয়ে পড়বে— এই আশঙ্কা আর কোনো অতিরঞ্জিত বিষয় নয়।

শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী সতর্ক করেছেন, 'আজ যদি প্রশাসন ব্যর্থ হয়, আগামীকাল এই মাটিতে বাঙ্গালি হিন্দু কেবল ইতিহাসের চরিত্র হয়ে যাবে।' একসময় বুদ্ধিজীবী, লেখক, সংস্কৃতিকর্মীরা এই রাজ্যের গৌরব ছিলেন, আজ তাঁদের কণ্ঠে হিরণ্ময় নীরবতা। তাঁরা জানেন, সত্য বললে বিপদ। আর এই নীরবতার মাশুল দিচ্ছে সাধারণ মানুষ— যাঁরা জেহাদি তোষণের রাজনীতির বলি হচ্ছে প্রতিদিন। এই প্রেক্ষাপটে ২০২৬ সালের নির্বাচনকে শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী বলেছেন, 'শেষ সুযোগ'। এই সুযোগ রাজনৈতিকভাবে, প্রশাসনিকভাবে, সাংস্কৃতিকভাবেও। কারণ এবারও যদি বঙ্গবাসী নিজেদের সুরক্ষার দায় নিজেদের হাতে না নেয়, তবে আর কোনো সুযোগ বাকি থাকবে না। তিনি লিখেছেন যে, ২০২৬ যদি ব্যর্থ হয়, তবে তার ফল হবে এক দুঃস্বপ্নের বাস্তবায়ন। তখন আর কেউ এই মাটির হিন্দু অস্তিত্ব নিয়ে কথা বলবে, কারণ তখন বলার মতো মানুষই থাকবে না। এসব প্রশ্নের শুধু উত্তর নয়, এসব অভিযোগের প্রেক্ষিতে দৃঢ় পদক্ষেপ প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নীরবতা এখন যেন এক জাতীয় প্রশ্ন। এই নীরবতা কি রাজনৈতিক কৌশল না প্রশাসনিক ব্যর্থতা? এই প্রশ্নের উত্তর আজই দিতে হবে, কারণ আগামীকাল হয়তো দেরী হয়ে যাবে।

পশ্চিমবঙ্গ আজ এক সংকটের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে, যেখানে নাগরিকদের আশা আর প্রশাসনিক প্রতিশ্রুতির মধ্যে এক গভীর ফাঁক তৈরি হয়েছে। এই ফাঁক পূরণ করতে না পারলে, ইতিহাস সাক্ষী থাকবে— একটি রাজ্য ধীরে ধীরে তার সাংস্কৃতিক সত্তা হারিয়েছে আর কেন্দ্র নীরব থেকেছে। তাই '২০২৬' শুধুই একটি বছর নয়— এটি বঙ্গবাসীর এক চূড়ান্ত পরীক্ষা। বাঙ্গালি হিন্দুরা কি নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবে, নাকি এক নতুন 'বিলুপ্তির ইতিহাস' রচিত হবে— সেই উত্তর সময়ই দেবে। কিন্তু সেই সময়ও দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। একথা সত্য যে, শ্রীত্রিপাঠী পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালি হিন্দুদের মনের কথাটি 'স্বস্তিকা'র পাতায় তুলে ধরেছেন।

—**কুন্তল চক্রবর্তী,**
বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা।

পশ্চিমবঙ্গ ধ্বংস হলে তার দায় এড়াতে পারে না কেন্দ্র

গত ১৬ কার্তিক, ১৪৩২ (৩ নভেম্বর, ২০২৫) স্বস্তিকা পত্রিকায় প্রকাশিত 'পশ্চিমবঙ্গকে রক্ষার দায়কার? শুধু বাঙ্গালি হিন্দুর, নাকি ভারত সরকারেরও?'—শীর্ষক প্রতিবেদনে লেখক শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী মহাশয় যে বিষয়ের অবতারণা করেছেন, তা এককথায় সময়োপযোগী ও প্রাসঙ্গিক। এই জ্বলন্ত বিষয়টি আজ সমগ্র সাধারণ বঙ্গবাসীর অন্তরের কথা ও চাহিদা। পশ্চিমবঙ্গ জেহাদি শক্তির আখড়া হয়ে উঠছে, এ রাজ্য বাঙ্গালি হিন্দুর বধ্যভূমিতে পরিণত হচ্ছে, আইন-শৃঙ্খলা সমেত সমস্ত সাংবিধানিক ব্যবস্থা এ রাজ্যে ভেঙে পড়ছে ইত্যাদি দেখেও যদি কেন্দ্র শুধুমাত্র নির্বাক দর্শকের ভূমিকা পালন করে, তাহলে আগামীদিনে সমগ্র ভারতবর্ষের কাছে তারাও ক্ষমা পাবে না। কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রশাসনিক দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দেওয়া এবং এমন একটি সময়োপযোগী নিবন্ধ প্রকাশের জন্য ওই সংখ্যার 'উত্তর সম্পাদকীয়' লেখক এবং পত্রিকার সম্পাদক-সহ সম্পাদকীয় বিভাগকে জানাই অংসখ্য ধন্যবাদ।

—**ঈশ্বর গুপ্ত,** বরাহনগর, কলকাতা।

‘উঠ গো ভারতলক্ষ্মী’

সুতপা বসাক ভড়

‘উঠ গো ভারতলক্ষ্মী, উঠ আদি-জগত-জন-পূজ্যা’— অতুল প্রসাদ সেন রচিত এই গানটি গীতিগুঞ্জ থেকে গৃহীত। আজও অতিমাত্রায় প্রাসঙ্গিক। ভারতমাতাকে কবি এখানে ভারতলক্ষ্মীরূপে আরাধনা করেছেন, আখ্যায়িত করেছেন ‘আদি-জগত-জন-পূজ্যা’ রূপে। দেশপ্রেমিক অতুলপ্রসাদ সেন ব্রিটিশ শাসিত ভারতে এই গানটি রচনা করেন, যা সর্বসাধারণের মধ্যে এক অভাবনীয় আবেগ, উদ্দীপনা, স্বাধীন চেতনার অলিন্দ খুলে দিয়েছিল। রচনাকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাঙ্গালি তথা ভারতবাসীকে প্রভাবিত করেছে এই সর্বকালজয়ী গানটি।

আবার পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ভারতীয় সংস্কৃতিতে দেখা যায়, পুত্র যেমন বংশ রক্ষা করে, তেমন সেই বংশকে কল্যাণস্পর্শ দিয়ে সিঞ্চিত করে কন্যা— সে যেকোনো রূপেই হোক-না-কেন। ঠাকুমা-দিদিমা-মা-বোন-স্ত্রী-কন্যারূপে সংসারকে সুকোমল রসে পরিপূর্ণ করে তোলেন। মহাপুরুষরা বলেছেন, নারী-পুরুষ হলো পাখির দুটি ডানা, ওড়ার জন্য দুটি ডানারই প্রয়োজন। এই ডানাদুটি হলো অতুলনীয়, অথচ অপরিসীম। পরিবার-সমাজ ও দেশের ধারয়িত্রী হলেন ঘরের লক্ষ্মী, তাঁরাই হলেন— ‘রাষ্ট্রস্য সুদৃঢ়া শক্তি সমাজস্য চ ধারিণী, ভারতে সংস্কৃতে নারী মাতানারায়ণী সদা।’

সংসারের দৈনন্দিন কাজে আমরা ঘরের লক্ষ্মীর কল্যাণময়ী রূপ দেখতে পাই ভোরবেলা থেকেই। আসমুদ্রহিমাচল সকল ভারতীয় নারী সকালে নিজ গৃহ সম্মুখ পরিষ্কার করেন; মা লক্ষ্মীকে আহ্বান করেন— ‘ইহাগচ্ছ, ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ, ইহ তিষ্ঠ।’ দক্ষিণ ভারতীয় মহিলারা প্রত্যেক দিন সকালে বাড়ির সম্মুখে, মন্দিরের সামনে জল দিয়ে পরিষ্কার করে ধুয়ে, চালগুঁড়ো, হলুদ দিয়ে আলপনা আঁকেন। অনেক বনবাসী ক্ষেত্রেও আমরা এই প্রচলন দেখতে পাই। আপামর ভারতীয় নারীরা ঘুম থেকে উঠে ‘বাসি কাপড়’ ছেড়ে, কাচা-কাপড় পরে গৃহকর্ম শুরু করেন। দেশে অনেক স্থানে এখনো রান্নাঘরের প্রথম রুটিটি গোমাতার জন্য রাখা হয়। এছাড়া কুকুর, পাখির জন্যও খাবার হলে রাখা হয়। গৃহলক্ষ্মীরা চাল পরিমাণ মতো বের করলেও, খানিকটা আবার তুলে রাখেন। দুপুরে আগত অতিথিদের অভুক্ত রাখা হয় না। বাড়ির কাজের লোকেদের জন্য যথোপযুক্ত আহারের ব্যবস্থা করেন। ভারতীয় সংস্কৃতিতে একজন গৃহলক্ষ্মী এঁটো খাবার যখনই আগুনে গরম করেন না, কারণ অগ্নিদেবতাকে অসম্মান করা হিন্দুদের সংস্কৃতিতে নেই।

প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে হিন্দুদের দিনচর্যা শুরু হয়, সেখানে বাড়ির লক্ষ্মী অপচয়ের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। পূজা-পার্বণে সমাজের সকলের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়। বাড়ির কাজের লোকেদের সঙ্গেও। বাড়ির নিত্য পূজা-অর্চনা মূলত গৃহলক্ষ্মীরাই করে থাকেন। বিশেষ বিশেষ তিথি মনে রাখা এবং তা যথাযথভাবে পালন করার মুখ্য দায়িত্বও সাধারণত তাঁরাই করেন। সংসারে অব্যবহৃত জিনিসপত্র ব্যবহারোপযোগী করে তোলার শিক্ষাও আমরা তাঁদের কাছে পাই। তাঁরা অতি সাধারণ উপকরণ দিয়ে এমন কিছু অসাধারণ রান্না করতে পারেন, যা বড়ো বড়ো হোটেলের রাঁধুনিরাও অবাক হন। তাঁরা গৃহলক্ষ্মী, গৃহের রক্ষাকর্ত্রী, তাই স্বাভাবিক ভাবেই নিজ কর্তব্য পালন করেন। বর্তমানে বিশ্ব-বাণিজ্য, বিশ্বায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ডিপ স্টেটের নাম বারবার উঠে আসছে। তারা অস্থিরতা সৃষ্টি করছে বাংলাদেশ, ভুটান, মায়ানমারের মতো ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলিতে। ভারতকেও বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে, কিন্তু আমাদের রক্ষা করে চলেছে ভারতীয় পরম্পরা, সংস্কৃতি এবং জ্ঞান ভাণ্ডার। সুতরাং নিজেরা গৃহলক্ষ্মীর ভূমিকা সম্যকরূপে পালন করার সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী প্রজন্মকেও এই শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার কর্তব্য মায়েদের। বিদেশি মিশনারি পরিচালিত স্কুলগুলি এই শিক্ষা দেয় না। এই শিক্ষা পাওয়া যায় বাড়ি পরিবার থেকে। গ্রিস, মিশর, পারস্যের মতো অনেক দেশ নিজেদের সংস্কৃতি বজায় রাখতে অপারগ হয়েছে, কারণ তারা তাদের সংস্কৃতি-পরম্পরাকে যথাযথ গুরুত্ব সহকারে ধরে রাখতে পারেনি। আমরা সনাতন ধর্ম পালন করে চলেছি, যা যুগানুকূল ও সময়ানুকূল।

আমরা পুনরায় স্মরণ করব, ভারতের প্রতিটি গৃহের গৃহলক্ষ্মীদের। তাঁরা সম্মিলিত শক্তির উৎস। তাই ভারত সন্তানসন্ততির জয় অবশ্যম্ভাবী। সেজন্য প্রতিটি গৃহের গৃহলক্ষ্মীরা পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যেও এই জাতীয়তাবোধ, পরম্পরা, সংস্কৃতি প্রবাহিত করবেন, কথা বলাই বাহুল্য। ▯

গ্লোসাইটিস সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে

ডাঃ বলরাম পাল

দৈনন্দিন চিকিৎসক জীবনে আমরা প্রায়শই এমন রোগী পাই যেখানে রোগী এসে বলে— ডাক্তারবাবু, গরম কোনো জিনিস একদম খেতে পারছি না। জিভ একেবারে জ্বলে যাচ্ছে। কেউ আবার নোনতা বা ঝাল খেলে মুখের মধ্যে জ্বলে যাওয়ার মতো অনুভবের কথা বলেন। আমরা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার মাধ্যমে খুব সহজেই এ ধরনের রোগকে সারিয়ে তুলতে পারি। বিষয় সেটা নয়, বিষয় হলো কীভাবে এই রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

আগে জানতে হবে গ্লোসাইটিস কী :

গ্লোসাইটিস হলে যেমন গরম নোনতা ও ঝাল খেতে গেলে জ্বালা অনুভূত হয়, তেমনি এই রোগে জিভের রং টকটকে লাল হয়ে যায়। কখনো জিভ ফুলে গিয়ে ব্যথা হতে পারে। জিভের উপরে দানা দানা ফুসকুড়ি বেরোতে পারে। অনেক সময় খাদ্য পানীয় গিলতেও অসুবিধা হয়। আবার জিভের স্বাদও চলে যায়। খাবার দেখলেই যেন একটা আতঙ্ক। একটা কথা মনে রাখতে হবে, যদিও মুখের ভিতর চট করে সমস্যা হয় না, কারণ মুখগহ্বর নিঃসৃত লালার মধ্যে লাইসোজাইম নামক একপ্রকার এনজাইম আছে যা ব্যাকটেরিয়া নাশক। তথাপি কিছু বিশেষ ধরনের ব্যাকটেরিয়া ও ফাঙ্গাসের প্রভাবে এবং কিছু ভিটামিন বা খনিজের অভাবে গ্লোসাইটিস হতে পারে।

নানাবিধ কারণে গ্লোসাইটিস হতে পারে :

- ডায়াবেটিস।
- ভিটামিন বি-র অভাব।
- অতিরিক্ত মানসিক চাপ।
- কোনো কারণে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলে।
- দীর্ঘ সময় ধরে অ্যান্টিবায়োটিক সেবন করলে।
- জর্দা-সুপারি দিয়ে পান, গুটখা, সিগারেট ইত্যাদির নেশা থাকলে।
- মুখ খুলে বা হাঁ করে ঘুমোনোর অভ্যেস থাকলে মুখের লালা শুকিয়ে যাওয়ার ফলে।
- দাঁতের সমস্যায়, বিশেষ করে বয়স্ক মানুষদের দাঁত ভেঙে বা ক্ষয়ে গিয়ে ধারালো হয়ে যায়, তখন খেতে বা কথা বলতে গিয়ে ধারালো দাঁতে বারবার জিভে আঘাত লাগে, যা জিভে ক্ষত তৈরি করে। এছাড়া বাঁধানো দাঁত খোলা-পরার সময় বার বার ঘষা লেগে ক্ষত তৈরি করতে পারে।
- নিয়মিত মুখের ভিতর পরিষ্কার না করলেও সমস্যা হতে পারে। সাধারণত আমরা সকালে ঘুম থেকে উঠে বা রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে ব্রাশ করি। অনেকেই আছেন যারা বারবার চা পান করেন কিন্তু মুখ ধোয়ার কথা মাথায় রাখেন না। এক্ষেত্রে পরামর্শ, যতবার চা খাওয়া হবে ততবার মুখ ধুয়ে ফেলতে হবে। এতে জীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। দাঁত পরিষ্কারের জন্য বহুদিনের পুরনো ব্রাশ ব্যবহার না করাই ভালো। ব্রাশ শক্ত হয়ে গেলে তার খোঁচায় স্টোমাটাইটিস (মুখের ভিতর ঘা) হয়, যা থেকে পরবর্তীতে গ্লোসাইটিসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মনে রাখতে হবে, গোসাইটিস এবং স্টোমাটাইটিস-এর কারণ মোটামুটি এক। স্টোমাটাইটিসে ঠোঁটের ভিতরে ক্ষত তৈরি হয়। দুটো ক্ষেত্রেই মুখের ভিতরে যাতে লালা ঠিকমতো তৈরি হয় এবং মুখের ভিতর যাতে পরিষ্কার থাকে সেদিকে নজর দিতে হবে। এবড়োখেবড়ো ধারালো দাঁত থাকলে তুলে ফেলা বা ঘসে মসৃণ করে দেওয়ার প্রয়োজন।

গ্লোসাইটিস বা স্টোমাটাইটিস, মুখের ভিতর যে অসুখই হোক না কেন, তা খুবই কষ্টদায়ক। তাই সচেতন হওয়া খুব জরুরি। যেমন কিছু খাওয়ার পরে ভালো করে মুখ ধুয়ে ফেলতে হবে। অতিরিক্ত ঝাল খাওয়ার প্রবণতা কমাতে হবে। খুব ঠাণ্ডা বা গরম খাওয়া চলবে না। দাঁত ধারালো হয়ে গেলে বা বাঁধানো দাঁত পরতে অসুবিধা হলে দন্ত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

ডায়াবেটিস হলে তাঁর নিয়ন্ত্রণে রাখা একান্ত প্রয়োজন। ধ্যান, যোগাসন করে মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। রক্তে হিমোগ্লোবিন বা শরীরে ভিটামিন বি-এর অভাব হলে ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নিয়ে ডায়েটের মধ্যে দিয়ে তা পূরণ করতে হবে।

আমরা যদিও জানি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট রোগের কোনো নির্দিষ্ট ওষুধ হয় না তথাপি বিশেষ কয়েকটি ওষুধের নাম উল্লেখ করতে হয় যেগুলি গ্লোসাইটিস বা জিভে ঘায়ের অসুখে খুবই ফলপ্রসূ। যেমন : Apis Mel, Argentum Nit, Borax, Lachesis, Merc Sol, Acid Mur, Acid nit, Nat Mur ইত্যাদি। □

ভারতের জনজাতি সমাজ ভারতীয় সমাজেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ

প্রণবজ্যোতি ভট্টাচার্য

ভগবান বীরসা মুণ্ডা

ভারতের জনজাতি সমাজ ভারতীয় সমাজেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। শাসন আর শোষণ চালাতে গিয়ে ভারতাত্মার এই অঙ্গটাই কেটে দিয়েছিল ব্রিটিশ শাসক। 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' পলিসি নিয়ে যেভাবে তৎকালীন ব্রিটিশ শাসক ভারতের বুকে রোপণ করেছিল হিন্দু- মুসলমানের মধ্যে বিদ্বেষের বিষবৃক্ষ, ঠিক সেভাবেই হিন্দুদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল জনজাতিদের। ব্রিটিশ শাসন তো বটেই, তার পর স্বাধীন ভারতের কংগ্রেস সরকারের শাসনকালেও উপেক্ষিতই ছিলেন জনজাতি সমাজের মানুষরা। দীর্ঘদিনের সেই বঞ্চনার ফলেই স্বাধীন ভারতে মাথাচাড়া দিয়েছিল মাওবাদীরা। যাদের কেবল বাগে আনাই নয়, প্রায়-নির্মূল করে ফেলেছে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার।

অথচ, এই জনজাতির মানুষরাই ভারতীয় সত্তার শেকড়। সেই শেকড়েই বিষ ঢেলে দিয়ে ভারতভূমিকে বিষাক্ত করতে চেয়েছিল লুঠেরা ইংরেজের দল। শেষপর্যন্ত তারা ব্যর্থ হলেও চালিয়ে গিয়েছিল বিদ্বেষের বীজ বপনের কাজ। তার পরেও শাসকের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে লড়াই চালিয়ে গিয়েছিলেন জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ। তাঁদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতিরক্ষা এবং দৈনন্দিন জীবনে যাতে স্বতন্ত্র জীবনযাত্রা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে তার জন্য তাঁরা নানা সময় ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছেন। ব্রিটিশের অত্যাধুনিক হাতিয়ারের কাছে তাঁদের তির-ধনুকের মতো পুরানো দিনের অস্ত্র হয়তো হার মেনেছে বারবার, তবে তার পরেও হাল ছাড়েননি তাঁরা।

ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য জনজাতীয় বিদ্রোহগুলির মধ্যে অন্যতম হলো কোল বিদ্রোহ। ভারতের ছোটনাগপুর এলাকার বাসিন্দা এই কোলরা। বণিকের ছদ্মবেশে আসা ব্রিটিশদের হিন্দুস্থানে পা পাখার আগে পর্যন্ত তাঁরা তাঁদের ঐতিহ্যবাহী প্রধানদের অধীনে সম্পূর্ণভাবে স্বায়ত্তশাসন ভোগ করতেন। ব্রিটিশরা শাসন কবজা করেই তাঁদের এই অধিকারে হস্তক্ষেপ করে। জনজাতি নয় এমন মহাজন, জমিদার ও ব্যবসায়ীদেরও তারা লেলিয়ে দিয়েছিল জনজাতিদের জঙ্গলের অধিকার হরণ করতে। ব্রিটিশ আশ্রিত জমিদারের পেটে চলে

চক্র বিশোই

রানি গাইদিনল্যু

সিধু ও কানু মুর্মু

অল্লুরি সীতারাম রাজু

যায় জনজাতি সম্প্রদায়ের প্রাণের জমি-জিরেত, অরণ্য সম্পদ। যার জেরে ক্রমশ ঋণের জালে জড়িয়ে পড়তে থাকেন বনাঞ্চলে বাস করা এই মানুষরা। দারিদ্র্যের কারণে তাঁরা কার্যত পরিণত হন বন্ডেড লেবারে। নিজেদেরই জমিতে ভূমিহীন শ্রমিক হিসেবেও কাজ করতে বাধ্য হন তাঁদের অনেকেই। ব্রিটিশ শাসনে তাঁদের দুর্দশা আরও বেড়ে যায়। এসব পুঞ্জীভূত ক্ষোভের আগুনেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৮৩১ সালে। ব্রিটিশ সরকার ও বহিরাগতদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন তাঁরা। বছর দুয়েক ধরে চলা এই কোল বিদ্রোহের জেরে প্রাণ হারায় অনেক অ-উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষও। তাদের ঘরবাড়িও পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। কোলদের এই সশস্ত্র বিদ্রোহ নির্মমভাবে দমন করেছিল ব্রিটিশ শাসক। কোলদের রুদ্রমূর্তি এবং ভয়াবহ বিদ্রোহ দমন করতে কলকাতা ও বারাণসী থেকে তলব করতে হয়েছিল ব্রিটিশ সেনাদের। এই সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বুধু ভগত।

ইংরেজদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন সাঁওতাল সমাজের মানুষরাও। ইতিহাসে এটাই 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' নামে খ্যাত। ইতিহাসবিদদের মতে, ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ভারতের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জনজাতি আন্দোলন ছিল এটাই। ১৭৯৩ সালে যখন বঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হয়, তখন সাঁওতাল জনজাতির লোকেদের শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ করা হয়।

এজন্য তাঁদের মজুরি কিংবা খাজনামুক্ত জমি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসক তাঁদের সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ না করেই শাসনের অছিলায় শুরু করে শোষণ। এর পরেই ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হন সাঁওতালরা। লখিমপুরে সাসানের বীর সিংহের নেতৃত্বে প্রথমবারের মতো সংগ্রাম শুরু করেন তাঁরা। দ্বিতীয়বার তাঁরা যুদ্ধ করেছিলেন ১৮৫৫-৫৬ সালে। এই যুদ্ধের সময় সাঁওতালরা দখল করে নিয়েছিলেন রাজমহল ও ভাগলপুরের মধ্যবর্তী অঞ্চলগুলি। এই সময় আন্দোলনকারীদের প্রধান লক্ষ্যই ছিল যেনতেনপ্রকারে ঘোচাতে হবে বিদেশি শাসনের গ্লানি। সাঁওতালদের এই সর্বাত্মক সংগ্রামের ডাক দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল ওড়িশা ও বিহারের বীরভূম, হাজারিবাগ, সিংভূম, পুরুলিয়া ও মুঙ্গের জেলায়। ১৮৫৫ সালে শুরু হওয়া এই যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সিধু মুর্মু ও কানু মুর্মু। এঁরা ১০ হাজারেরও বেশি সাঁওতালের বাহিনী তৈরি করে এলাকা থেকে ব্রিটিশ শাসনকে উৎখাত করে তাঁদের নিজস্ব শাসন ব্যবস্থা চালু করেন। সংগ্রামের এই পর্বে সাঁওতালরা ভাগলপুর ও রাজমহলের মধ্যে ডাক ও রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন। হামলা চালান ব্রিটিশ আশ্রিত জমিদার, মহাজন, রেল কর্তা ও ব্রিটিশ শাসকদের বাসভবনে। তবে সাঁওতালদের এই আন্দোলনের জেরে প্রথমে খানিক পিছু হটলেও, ১৮৫৬ সালে ইংরেজরা নির্মমভাবে দমন করে জনজাতিদের এই সংগ্রাম।

ব্রিটিশদের রুখে দাঁড়িয়েছিল খোন্দ জনজাতির মানুষরাও। ভারতে ব্রিটিশ আসার আগে এই উপজাতির মানুষ ভোগ করতেন স্বায়ত্তশাসন। এঁদের দখলে ছিল বঙ্গ থেকে তামিলনাড়ু পর্যন্ত বিস্তীর্ণ বনভূমি এলাকা। তাঁদের রাজপাট মূলত দুর্গম পাহাড়ি ভূখণ্ডে। ব্রিটিশদের শোষণমূলক বন-নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন তাঁরা। নেতৃত্ব দেন চক্র বিসোই। ১৮৩৭ থেকে ১৮৫৬ সালের মধ্যবর্তী সময়ে চলা এই আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন ঝুমুসার, কালাহাণ্ডি ও পাটনার জনজাতি জনগোষ্ঠীর মানুষও। রাধাকৃষ্ণ দণ্ডসেনার নেতৃত্বে কিছু আঞ্চলিক গোষ্ঠীও তাঁদের সমর্থন করেছিল। ১৯৫৫ সালে বন্দি করা হয় চক্র বিসোইকে। তার পরেই কমে যায় আন্দোলনের তীব্রতা।

উল্লেখ্য যে, ১৭৮৯ থেকে ১৮৩২ সালের মধ্যে মুণ্ডারা মহাজন ও ব্রিটিশ শাসকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রায় সাতবার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পর অনেক মুণ্ডারা উন্নত ভবিষ্যতের আশায় 'ইভাঞ্জেলিক্যাল লুথেরান মিশনে'র পক্ষে সায় দিয়েছিলেন। যদিও পরে অনেকে এই মিশনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। যখন তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে এই মিশনারিরা তাঁদের দীর্ঘমেয়াদি লাভ দিতে পারবে না, তখন তাঁরা আরও বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলেন। এই আন্দোলনের নাম ছিল 'সরদারিলাদাই' বা 'নেতাদের যুদ্ধ'। আন্দোলনকারীরা তাঁদের জমিতে মুণ্ডা ঐতিহ্যবাহী নেতাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা 'খুনটকাট্টি ব্যবস্থা' পুনরুজ্জীবিত করার জন্যও লড়াই করেছিলেন। তবে এই আন্দোলনগুলি যোগ্য নেতার অভাবে বিশেষ ছাপ ফেলতে পারেনি। ১৮৯৯ সালে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন ভগবান বীরসা মুণ্ডা। পুনরায় আশার দিগন্তে নতুন ভোরের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন তাঁরা। তাঁরা ব্রিটিশদের থানা, গির্জা এবং অন্যান্য সম্পত্তি দখল করেন। ১৯০০ সালে ব্রিটিশ পুলিশ গ্রেপ্তার করে বীরসাকে। তাঁকে রাখা হয়েছিল জেলে। মাত্র ২৫ বছর বয়সেই কলেরায় ভুগে জেলেই মৃত্যু হয় তাঁর।

ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিলেন ওঁরাও সমাজের মানুষরাও। ১৯১৪ থেকে

১৯১৯ সাল পর্যন্ত ওঁরাওদের এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন তানা ভগত। প্রাথমিক পর্যায়ে এই আন্দোলন ছিল কেবল একটি ধর্মীয় আন্দোলন। পরে তাঁরা সত্যাগ্রহ বা আইন অমান্য আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে ব্রিটিশ শাসনের কর-ব্যবস্থার বিরোধিতা করেন। ইতিহাসবিদদের মতে, এই আন্দোলন এক ধরনের 'সাংস্কৃতিক' আন্দোলন। তবে ভগতরাও গান্ধীজীর মতো অহিংসার পূজারি ছিলেন। শেষপর্যন্তও এই বিদ্রোহও নির্মমভাবে দমন করে ব্রিটিশ শাসক।

রাম্পা বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অল্লুরি সীতারাম রাজু। বর্তমান অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম ও পূর্ব গোদাবরী জেলায় দানা বেঁধেছিল এই আন্দোলন। এএস রাজু বঙ্গের বিপ্লবীদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, যা তাঁকে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে প্রেরণা দিয়েছিল। এই বিদ্রোহ ১৯২২ থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। অল্লুরি ও তাঁর সমর্থকরা অনেক থানায় পিকেটিং করেছিলেন। অস্ত্র ও গোলাবারুদের দখল নিতে হত্যা করেন একাধিক আধিকারিককে। এই আন্দোলনের প্রতি স্থানীয় জনগণের একটা বড়ো অংশেরই সমর্থন ছিল। কড়া হাতে এই আন্দোলনও দমন করে ব্রিটিশ পুলিশ।

এসব সংগ্রামে সংগঠিত পাশাপাশি আরও কয়েকটি জনজাতি সংগ্রামে সংঘটিত হয়েছিল ইংরেজদের দেশছাড়া করতে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, খাসিয়া সংগ্রাম, আহোম সংগ্রাম এবং সিংফোস সংগ্রাম। বার্মিজ যুদ্ধের পর ব্রিটিশরা গারো ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী পাহাড়ি অঞ্চল দখল করে। ইংরেজরা খাসিয়া অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে একটি রাস্তা তৈরি করতে চেয়েছিল। মূলত এর বিরুদ্ধেই ফুঁসে ওঠেন খাসিয়া জনজাতির লোকেরা। তাঁদের এই সংগ্রামের নেতৃত্বে দিয়েছিলেন তিরুত সিংহ। পরে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন গারোরাও। লড়াই চলে দীর্ঘ চার বছর ধরে। শেষমেশ ১৮৩৩ সালে কড়া হাতে তাদের দমন করে ব্রিটিশ শাসক।

ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলেন আহোমরাও। তাঁদের এই সংগ্রাম ইতিহাসে আহোম বিদ্রোহ নামে খ্যাত। প্রথম বর্মা যুদ্ধ (১৮২৪-১৮২৬) শেষ হওয়ার পর ব্রিটিশরা তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহারের প্রতিশ্রুতি

ফুলো মুর্মু ও ঝানো মুর্মু

দিয়েছিল। যদিও তারা কথা রাখেনি। উলটে আহোম অঞ্চলের ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার চেষ্টা করে ব্রিটিশরা। এতেই খেপে যান আহোমরা। ১৮২৮ সালে গোমধর কোনয়ারের নেতৃত্বে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়। আন্দোলনের তীব্রতায় অতিষ্ঠ হয়ে শেষমেশ ব্রিটিশরা মহারাজা পুরন্দর সিংহ নরেন্দ্রের কাছে উচ্চ অসম ও রাজ্যের আরও কয়েকটি এলাকা হস্তান্তর করে একটি সমঝোতা নীতি অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

ব্রিটিশদের চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন সিংফোসরাও। তাঁরা যখন খাসিয়াদের আন্দোলন দমাতে ব্যস্ত ছিল, সেই সময় বিদ্রোহ ঘোষণা করে সিংফোসরা। তাঁদের এই আন্দোলন মাত্রই কয়েক মাস স্থায়ী হয়েছিল। যদিও এই স্বল্প সময়ে সিংফোস বিদ্রোহীরা হত্যা করেছিলেন বেশ কিছু ব্রিটিশ দালালকে। ১৮৪৩ সালে সিংফোসের প্রধান নিরং ফিদু ব্রিটিশ গ্যারিসন আক্রমণ করেছিলেন। অনেক সৈন্যকে হত্যাও করেছিলেন। ১৮৪৯ সালে

বুধু ভগত

খাসমা সিংফোস অসমের একটি ব্রিটিশ এলাকার বিরুদ্ধে অভিযানও চালান। শেষমেশ এই বিদ্রোহও দমন করে ব্রিটিশ শাসক।

ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক হলেন উত্তর-পূর্ব ভারতের রানি গাইদিনলিউ। নাগা জনজাতি সমাজের রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক নেত্রী ছিলেন রানি। ১৯২৮ সালে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা যুদ্ধে তিনি যোগদান করেন। তাঁর নেতৃত্বে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে নাগা যোদ্ধারা। ১৯৩২ সালে ব্রিটিশ প্রশাসনের হাতে তিনি গ্রেপ্তার হন। তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয় ব্রিটিশ শাসক। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ১৯৪৭ সালে তাঁর কারামুক্তি ঘটে।

ভারত শাসনের স্বার্থে ইংরেজরা অনুসরণ করেছিল 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' নীতি। তার জেরেই জমাট বাঁধতে পারেনি বিভিন্ন জনজাতির আন্দোলন। জনজাতিদের হিন্দুদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ায় বস্তুত তাঁরা নিজেদের অন্ত্যজ বলেই ভাবতে শুরু করেন। ব্রিটিশ মনোভাবাপন্ন হিন্দুরাও নিজেদের উচ্চবর্ণের বলে জনজাতিদের আন্দোলনে শামিল হননি। যার জেরে প্রায় দুশো বছর ব্রিটিশদের অধীনে পরাধীন থাকতে হয়েছিল ভারতবাসীকে। পরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে জ্বলে ওঠে পুঞ্জীভূত ক্ষোভের আগুন। সেই আগুনে যাতে পুড়ে মরতে না হয়, তাই ভারত ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয় ইংরেজরা। আর ইংরেজদের চালে ক্ষতবিক্ষত হয় ভারতবর্ষ। হিন্দু সমাজ হয়ে যায় টুকরো টুকরো। স্বাধীনতার দীর্ঘ ৭৮ বছর পরেও সেই ক্ষত শুকোয়নি একটুও, বরং রয়ে গিয়েছে দগদগে। সেই ক্ষত নিরাময় করার কাজ করে চলেছে বনবাসী কল্যাণ আশ্রম ১৯৫২ সাল থেকে।

জনজাতি স্বাভিমান রক্ষার অগ্রদূত

ভগবান বীরসা মুণ্ডা

সরোজ চক্রবর্তী

ভগবান বীরসা মুণ্ডা ছিলেন একজন জনজাতি নেতা ও সমাজ সংস্কারক। জনজাতি সমাজের স্বাভিমান ও অধিকার রক্ষা এবং ব্রিটিশ শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি লড়াই করেছিলেন। জনজাতি মুণ্ডা সম্প্রদায়কে সংগঠিত করে 'মুণ্ডা বিদ্রোহ' শুরু করেন। তাঁর নেতৃত্বে সংঘটিত এই বিদ্রোহের মূল লক্ষ্য ছিল দেশীয় সরকার এবং স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা। এটি 'উলগুলান' বা 'বিপজ্জনক অবস্থা' মহা অশান্তি নামে পরিচিত। তিনি তাঁর অনুগামীদের কাছে 'বীরসা ভগবান' বা 'ধরতি আবা' বা 'বিশ্বপিতা' নামে পরিচিত ছিলেন।

তিনি জনজাতিদের চিরাচরিত ভূমির অধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচার রক্ষার জন্য লড়াই করেছিলেন, যা তাঁকে আজও স্মরণীয় করে রেখেছে। তিনি মুণ্ডা সমাজের সংস্কারের জন্য কাজ করেছিলেন এবং নিজস্ব ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি রক্ষার আন্দোলন শুরু করেছিলেন। জনজাতিদের কাছে তিনি 'ভগবান' হিসেবে পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁর নেতৃত্ব ও সংগ্রামের জন্য তিনি আজও শ্রদ্ধেয়। তাঁর জন্মদিন ১৫ নভেম্বর যা ভারতে 'জনজাতি গৌরব দিবস' হিসেবে পালিত হচ্ছে। তাঁর সম্মানার্থে ২০০০ সালে ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠিত হয়, যা জনজাতি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অবদান স্মরণ করে। মহাশ্বেতা দেবীর জনপ্রিয় উপন্যাস 'অরণ্যের অধিকার' ভগবান বীরসা মুণ্ডার জীবন নির্ভর।

ভগবান বীরসা মুণ্ডার স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করা হয়েছে যা 'বিদ্রোহের মূর্তি' নামে নিবেদিত। ২০২১ সালে রাঁচীর পুরাতন কেন্দ্রীয় কারাগারে একটি জাদুঘর উদ্বোধন করা হয়েছে, যেখানে বীরসা মুণ্ডা শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বিদ্রোহের মূর্তি নামে পরিচিত বীরসা মুণ্ডার মূর্তিটি জাদুঘরে রক্ষিত। তাঁকে ঐতিহ্যবাহী জনজাতীয় পোশাক পরিহিত দেখানো হয়েছে, যা জনজাতিদের নেতা হিসেবে তাঁর পরিচয়ের প্রতীক। তাঁকে বীরত্বপূর্ণ ভঙ্গিতে চিত্রিত করা হয়েছে। তিনি ঐতিহ্যবাহী জনজাতীয় অস্ত্র যেমন ধনুক, তির, বিদ্রোহের প্রতীক বর্শা ধারণ করে আছেন।

২০২৩ সালে ভগবান বীরসা মুণ্ডার জন্মবার্ষিকীতে আর্থিকভাবে দুর্বল জনজাতি গোষ্ঠীগুলির কল্যাণমূলক পদক্ষেপগুলি কার্যকরভাবে সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য 'প্রধানমন্ত্রী জনজাতি ন্যায় মহা অভিযান' নামে একটি উদ্যোগ শুরু করা হয়েছে।

ভগবান বীরসা মুণ্ডা তাঁর জীবদ্দশায় ভারতীয় ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন রেখে গিয়েছেন তাঁর সাহসী নেতৃত্ব এবং জনজাতি সম্প্রদায়ের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার প্রতি অটল অঙ্গীকারের মাধ্যমে। জনজাতিদের সমাজিক ক্ষমতায়নের তিনি এক আলোকবর্তিকা হয়ে ওঠেন। তাঁদের ভূমির অধিকার, সাংস্কৃতিক সংরক্ষণ এবং সামাজিক ন্যায় বিচারের পক্ষে কথা বলেন। বিশাল বিরোধিতার মুখোমুখি হওয়া এবং শেষপর্যন্ত এক করুণ পরিণতির স্বীকার হওয়া সত্ত্বেও অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে এবং জনজাতি সমাজের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার জন্য লড়াই করতে নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে।

ভগবান বীরসা মুণ্ডা ১৮৭৫ সালের ১৫

নভেম্বর বর্তমান ছত্তিশগড়ের উলিহাতু গ্রামে মুণ্ডা জনজাতির এক সাধারণ কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সুগনা মুণ্ডা এবং মাতা কার্মি হাতু ছিলেন কৃষিজীবী। ঔপনিবেশিক শাসন এবং সামাজিক বৈষম্যের মধ্যেও তাঁরা তাঁদের পরিবারকে টিকিয়ে রাখার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতেন। শৈশব থেকেই মুণ্ডাদের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং আধ্যাত্মিক অনুশীলনের প্রতি ভীষণভাবে আগ্রহী ছিলেন বীরসা মুণ্ডা। তিনি খুব বেশি শিক্ষিত ছিলেন না। কিন্তু কিছু সময়ের জন্য খ্রিস্টান মিশনারি স্কুলে পড়াশোনা করেন। সেই সময় তাঁকে খ্রিস্টানে ধর্মান্তরিত করা হয়। তাঁর শৈশবের একটা বড়ো অংশ চাইবাসায় অতিবাহিত হয়। সেখানে স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মকাণ্ড দ্বারা তিনি প্রভাবিত হন। এই সময় থেকেই তাঁর মধ্যে তীব্র ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব তৈরি হয়। ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে অন্যান্য জনজাতি সম্প্রদায়ের মতো মুণ্ডারাও তাদের জমি ও সম্পদের উপর বহিরাগতদের দখলের কারণে শোষণ, উচ্ছেদ ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের সম্মুখীন হয়েছিল। বীরসা মুণ্ডা সেই অবিচারের কারণে গভীরভাবে বিরক্ত ছিলেন।

রাঁচির ট্রাইবাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের গবেষক বিবেক আরিয়ানের মতে, বীরসা মুণ্ডা স্কুল ছাত্র থাকাকালীন উপজাতিদের স্বাভিমান রক্ষার বিষয়টি বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর সক্রিয়তার ফলে ১৮৯০ সালে তাকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হয়। এরপর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে তিনি জনজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে করতে তাদের সংগঠিত করেন। ১৮৯৫ সালের মধ্যে তিনি ব্রিটিশদের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ হুমকি হয়ে ওঠেন। যার ফলে ২৪ আগস্ট ১৮৯৫ সালে চালকাদ গ্রাম থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঐতিহাসিক নথি থেকে জানা যায় যে, ১৯ নভেম্বর ১৮৯৫ সালে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০৫ ধারায় তাকে দু' বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ৩০ নভেম্বর ১৮৯৭ সালে মুক্তি পাওয়ার পর মুণ্ডা জনজাতিরা আবারও তাঁর নেতৃত্বে সংগঠিত হয়, যা একটি বৃহৎ আকারের সংগ্রামের ক্ষেত্র তৈরি করে।

১৮৯৯ সালের ২৪ ডিসেম্বর বীরসা মুণ্ডা জল, জঙ্গল ও জমির উপর জনজাতিদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য 'উলগুলান' শুরুর ঘোষণা করেন। এই বিদ্রোহের সময়, তাঁর হাজার হাজার অনুগামী নারী, পুরুষ, যুবক তাদের মাতৃভাষায় ঘোষণা করেন : 'ডিকু রাজ টুন্টু জানা— আবুয়া রাজ এত জানা', যার অর্থ 'বহিরাগতদের শাসন শেষ। আমাদের নিজস্ব শাসন শুরু হয়েছে।' এই আন্দোলনের ভয়ে ব্রিটিশরা নির্মম দমন-পীড়নের আশ্রয় নেয়। ১৯০০ সালের ৯ জানুয়ারি হাজার হাজার জনজাতি ধনুক-তির, বর্শা-সহ বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী অস্ত্র নিয়ে জোম্বারি বুরু পাহাড়ে একত্রিত হন। গুপ্তচরদের কাছ থেকে খবর পেয়ে ব্রিটিশরা বন্দুক ও কামান নিয়ে সশস্ত্র সৈন্যদের দিয়ে পাহাড় ঘিরে ফেলে। শুরু হয় এক ভয়াবহ যুদ্ধ। সেখানে বীরসা মুণ্ডা এবং তার অনুসারীরা বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। ১৯০০ সালের ২৫ জানুয়ারি 'দ্য স্টেটম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুসারে, সেই নৃশংস সংঘর্ষে প্রায় ৪০০ জন জনজাতি নিহত হন। তাদের রক্তে পাহাড় রঞ্জিত হয় এবং নিকটবর্তী নদীর জল লাল হয়ে যায়। ব্রিটিশরা বিজয়ী হলেও তারা বীরসা মুণ্ডাকে বন্দি করতে ব্যর্থ হয়। তবে তা ক্ষণস্থায়ী ছিল। ১৯০০ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি রাতে চাইবাসার ঘন জঙ্গলে থেকে তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় গ্রেপ্তার করে ব্রিটিশ পুলিশ।

তাঁকে গোপনে রাঁচিতে আনা হয় এবং ম্যাজিস্ট্রেট ডব্লিউ এস কুটুসের আদালতে বিচার করা হয়। যেখানে ব্যারিস্টার জ্যাকন তার বিচার করেন— যা ছিল কেবল একটি ভুয়া মামলা। রটানো হয় বীরসা মুণ্ডা কলেরায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। দুঃখজনকভাবে ৯ জুন জেলে রহস্যজনক ভাবে তাঁর মৃত্যু হয়। রাঁচির ডিস্টিলারি ব্রিজের কাছে তাঁর মরদেহ ফেলে দেওয়া হয়। তাঁর মহান আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এখন সেখানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি হয়েছে। রাঁচির যে কারাগারে বীরসা মুণ্ডা শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন, সেই জেলখানাকে বীরসা মুণ্ডা স্মৃতি সংগ্রহশালায় (স্মৃতি জাদুঘর) রূপান্তরিত করা হয়েছে।

ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জনজাতি আন্দোলন, যেমন বীরসা মুণ্ডার নেতৃত্বে উলগুলান কেবল ব্রিটিশ নিপীড়নকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেনি, বরং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকেও অনুপ্রাণিত করেছিল। ভগবান বীরসা মুণ্ডা খ্রিস্টমতে ধর্মান্তরণের বিরুদ্ধে যেমন সরব ছিলেন, তেমনি জনজাতি সম্প্রদায়ের মনে স্বাভিমান রক্ষার বিষয়ে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। জনজাতি সম্প্রদায়ের স্বাধিকার, সচেতনতা, আত্মরক্ষা, আত্মমর্যাদা, আধ্যাত্মিকতা ও সংস্কৃতি রক্ষার উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। তিনি জনজাতিদের তাঁদের আদি ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় ব্যবস্থা অনুসরণ করার পরামর্শ দিতে শুরু করেছিলেন। তাঁর শিক্ষায় মুগ্ধ হয়ে জনজাতি সমাজ তাঁকে 'ভগবান' হিসেবে শ্রদ্ধা করতেন। তিনি জনজাতিদের কাছে একজন সাধু পুরুষ হয়ে ওঠেন এবং তারা তাঁর আশীর্বাদ কামনা করতেন।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ভগবান বীরসা মুণ্ডার ভূমিকা অতুলনীয় ও চিরস্মরণীয়। তাঁর পার্থিব শরীরের নাশ হলেও তাঁর চিন্তাভাবনা, আদর্শ ও শিক্ষা প্রবাহিত হয়েছে সমগ্র জাতির অন্তরে। তিনি কেবল একজন স্বাধীনতা সংগ্রামীই ছিলেন না, একজন মহান সমাজ সংস্কারকও ছিলেন। তিনি জনজাতি সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার, বর্ণবৈষম্য, মাদকদ্রব্যের ব্যবহার এবং অন্যান্য সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি করেছিলেন। তিনি তাঁর অনুসারীদের শিক্ষার উপর জোর দিয়েছিলেন। সমানাধিকার ও ঐক্যের প্রচার করেছিলেন। তিনি 'বীরসায়ত' নামে একটি ধর্মীয় জাগরণর শুরু করেছিলেন, যা তাঁর অনুসারীদের আচরণের বিশুদ্ধতা, সরলতা ও সত্যের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ হতে উৎসাহিত করে। তিনি ঐতিহ্যবাহী মুণ্ডা বিশ্বাস, হিন্দুধর্ম ও খ্রিস্টমতের কিছু নীতির সমন্বয়ে একটি নতুন ধর্মীয় পথ তৈরি করেছিলেন। ভারতবর্ষের জাতি, ধর্ম ও সমাজ গঠনে ভগবান বীরসা মুণ্ডার অবদান চিরস্মরণীয়।

তথ্যসূত্র :

১. মহাশ্বেতা দেবীর 'অরণ্যের অধিকার'।

২. জনজাতিবাসী ওয়েবসাইট।

৩. Economic and Political Weekly, India Today.

৪. Organiser Weekly.

৫. VSK Bharat.

৬. Department of Public Relation, M.P.

ফ ঃ ৪

'বন্দে মাতরম্' সংগীতের সার্ধশতবর্ষ স্মরণে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের শোভাযাত্রা

সাহিত্য সম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বন্দে মাতরম্' সংগীতের ১৫০তম বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গত ৭ নভেম্বর বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের উদ্যোগে, সন্তসমাজের উপস্থিতিতে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন মঠ-মন্দিরের সাধুসন্ত-সহ অসংখ্য সাধারণ মানুষের সম্মিলিত উপস্থিতিতে এদিন মুখরিত হয়ে ওঠে কলকাতার পথঘাট।

এদিন উত্তর কলকাতার বাগবাজার বোসপাড়ায় অবস্থিত ভগিনী নিবেদিতার বাসভবন থেকে শোভাযাত্রাটি শুরু হয়। তারপর ভূপেন বোস অ্যাভিনিউ হয়ে শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মূর্তিতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন এবং বন্দে মাতরম্ সংগীত পরিবেশন করে বিধান সরণী হয়ে স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক বাসভবন সম্মুখে শোভাযাত্রাটি শেষ হয়। শোভাযাত্রায় সমবেত সাধুসন্তরা মাল্যদান, পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও আরতির মাধ্যমে স্বামীজীর মূর্তিতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। এরপর ভরত কুণ্ডুর কণ্ঠে পুনরায় 'বন্দে মাতরম্' সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে 'বন্দে মাতরম্'-এর সার্ধশতবর্ষ স্মরণ কর্মসূচির পরিসমাপ্তি ঘটে।

সঙ্ঘ শতবর্ষ উদ্‌যাপনে কালিয়াচকে বিশিষ্ট নাগরিক সম্মেলন

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে গত ৯ নভেম্বর মালদহের কালিয়াচকে অনুষ্ঠিত হলো 'বিশিষ্ট নাগরিক সম্মেলন'। সঙ্ঘের উদ্যোগের আয়োজিত এই সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দিনাজপুর বিভাগ সঙ্ঘচালক অপূর্ব কুমার দাস এবং মালদহ জেলা সহ-সঙ্ঘচালক রাজু কর্মকার।

সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কালিয়াচক, বৈষ্ণবনগর, গোলাপগঞ্জ, মোথাবাড়ি এলাকা থেকে সমাজের ১৩০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি।

বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে তুলে ধরেন সঙ্ঘের শতবর্ষের ইতিহাস। 'বন্দে মাতরম্' সংগীতের ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সকলের কণ্ঠে এই রাষ্ট্রগীতের মাধ্যমে এদিনের সম্মেলনের পরিসমাপ্তি ঘটে। সঙ্ঘ শতবর্ষ উপলক্ষ্যে একটি প্রদর্শনী সকলের মন কাড়ে।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, বাঘা যতীন ভাগের বিশিষ্ট নাগরিক সম্মেলন

গত ৯ নভেম্বর দক্ষিণ কলকাতায় যাদবপুরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয় 'বিশিষ্ট নাগরিক সম্মেলন'। এদিন অনুষ্ঠানমঞ্চে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ কলকাতার বাঘা যতীন ভাগ সঙ্ঘচালক শ্রী সীতেশ ভট্টাচার্য্য, জাতীয়তাবাদী সংবাদ সাপ্তাহিক 'স্বস্তিকা'র সহ-সম্পাদক শ্রী সুকেশচন্দ্র মণ্ডল এবং রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত বৌদ্ধিক প্রমুখ মৌমিতা বর। প্রায় ১৮০ জন বিশিষ্ট নাগরিক এদিনের সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও এদিনের সম্মেলনে ১০ জন সঙ্ঘের অধিকারী-সহ উপস্থিত ছিলেন ৫০ জন কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক।

উপস্থিত বিশিষ্ট নাগরিকদের মধ্যে মাতৃশক্তির অংশগ্রহণও ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ৪০ জন মহিলা এদিনের কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন।

ত্রিপুরায় বজরং দলের শৌর্য প্রশিক্ষণ বর্গ ও ত্রিশূল দীক্ষা কার্যক্রম

গত ৮ নভেম্বর বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, ত্রিপুরা প্রান্তের অন্তর্গত পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার খয়েরপুর-স্থিত সেবাধামে অনুষ্ঠিত হয় বজরং দলের শৌর্য প্রশিক্ষণ বর্গ এবং ত্রিশূল দীক্ষা কার্যক্রম। এই কার্যক্রমে প্রধান বক্তা ছিলেন বজরং দলের রাষ্ট্রীয় সহ-সংযোজক কিষাণ প্রজাপতিজী, প্রধান অতিথি ছিলেন ত্রিপুরা সরকারের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ বিভাগের সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার সুশান্ত বণিক। অনুষ্ঠানের বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন— মোহন্ত গয়ামুনিজী, ত্রিপুরা রাজ্যের প্রমুখ সন্ত শ্রীশ্রী কার্তিক প্রভু ত্র্যম্বকানন্দ পুরী জী মহারাজ, মিহিরানন্দজী মহারাজ এবং মাধবানন্দ সাধু বাবা মহারাজ জী। কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রান্ত সঙ্ঘচালক বিমল কান্তি রায়, ক্ষেত্র বজরং দল সংযোজক বিষ্ণু ভট্টাচার্য্য, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ত্রিপুরা প্রান্ত সংগঠন মন্ত্রী শশীকান্ত পাণ্ডে জী, প্রান্ত মন্ত্রী শঙ্কর রায়, প্রান্ত বজরং দল সংযোজক টুটন সাহা, প্রান্ত সহ-সংযোজক অমিত দেবনাথ-সহ অন্যান্য পদাধিকারীরা। প্রশিক্ষণ বর্গের বর্গ প্রমুখ ছিলেন শ্রী শচীন কলই। প্রধান বক্তা কিষাণ প্রজাপতি জী তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, বজরং দল হলো মন্দির মুক্তি থেকে বিধর্মী মুক্তি আন্দোলন এবং হিন্দু রক্ষার জন্য প্রাণ বলিদান করার মতো সংগঠন। দেশের ঐক্যবদ্ধ যুবসমাজের উপস্থিতিই হলো বজরং দল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ত্রিপুরা রাজ্যে বজরং দলের এই শৌর্য্য প্রশিক্ষণ বর্গ প্রতি বছরই হয়ে থাকে। এই ত্রিশূল দীক্ষা কার্যক্রম ত্রিপুরা রাজ্যে এই প্রথমবার অনুষ্ঠিত হলো। হিন্দুসমাজের যুবকদের হাতে থাকা এই ত্রিশূল তাঁদের আত্মরক্ষা ও পরিবার রক্ষার ক্ষেত্রে কার্যকরী হবে। এই বর্গে ৫০৩ জন যুবক ত্রিশূল দীক্ষা গ্রহণ করেছে। বর্গে অংশগ্রহণ করেছে ১১৫ জন শিক্ষার্থী। বর্গের শিক্ষক ছিলেন ১৫ জন এবং প্রবন্ধক ছিলেন ৪৫ জন। ত্রিপুরার গ্রাম ও নগরাঞ্চলের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট পদাধিকারী, মন্ত্রী ও বিধায়ক, নগরাঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার গণ্যমান্য ব্যক্তি ও কার্যকর্তারা এই বর্গে উপস্থিত থেকে হৈ কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচার বিভাগের সাংবাদিকদের মিলনোৎসব

গত ৮ নভেম্বর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের প্রচার বিভাগের উদ্যোগে কলকাতার মানিকতলা-স্থিত কল্যাণ ভবনে বিভিন্ন সংবাদপত্র, নিউজ চ্যানেলের সাংবাদিক ও ইউটিউবারদের নিয়ে আয়োজিত হয় একটি মিলনোৎসব। আশ্বিন-কার্তিক মাস জুড়ে দুর্গাপূজা, কালীপূজা, দীপাবলী, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, জগদ্ধাত্রী পূজা, সূর্যদেবের আরাধনা (ছটপূজা)-র শেষে সাংবাদিকদের মধ্যে পারস্পরিক প্রীতি-শুভেচ্ছা বিনিময়ের উদ্দেশ্যেই আয়োজিত হয় এই কার্যক্রম। রাষ্ট্রবাদী সাংবাদিকদের এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বরিষ্ঠ সাংবাদিক রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র সহ-প্রচার প্রমুখ ড. জিষ্ণু বসু, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত প্রচার প্রমুখ বিপ্লব রায়, সহ-প্রান্ত প্রচার প্রমুখ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী এবং প্রান্ত প্রচার টোলীর সদস্য ড. শিবাজী ভট্টাচার্য। বিজয়া সম্মেলনের সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বিপ্লব রায়।

জাতীয়তাবাদী সংবাদ সাপ্তাহিক 'স্বস্তিকা'র সম্পাদক ড. তিলক রঞ্জন বেরা, সহ-সম্পাদক সুকেশচন্দ্র মণ্ডল, স্বস্তিকার মুখ্য ব্যবস্থাপক জয়রাম মণ্ডল, স্বস্তিকার সম্পাদকীয় বিভাগের সদস্য অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায়, হিন্দি স্বস্তিকার কার্যকরী সম্পাদক ডাঃ আনন্দ পাণ্ডে, শঙ্খধ্বনির সম্পাদক দীপক কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, আকাশবাণী কলকাতার প্রবীর ভট্টাচার্য্য ও সুদীপ বসু, যুগশঙ্খ পত্রিকার রক্তিম দাশ, ঋতম বাংলা নিউজ পোর্টালের অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবীণ সাংবাদিক ও নাট্যকার সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, জনপ্রিয় ইউটিউবার পিনাকপাণি ঘোষ, মানব গুহ, শুদ্ধশীল ঘোষ, চিত্র সাংবাদিক স্বপন কুমার পাল-সহ বিশিষ্ট সাংবাদিকরা এদিনের অনুষ্ঠানে যোগ দেন। সংবাদপত্র, টিভি চ্যানেল, ইউটিউব চ্যানেলের মতো বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত সাংবাদিকদের এই মিলন উৎসবে তাঁর বক্তব্যে সাংবাদিকতার মাধ্যমে রাষ্ট্রবাদী বিমর্শ তুলে ধরার বিষয়টি তুলে ধরেন সুকেশচন্দ্র মণ্ডল। পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রবাদী সাংবাদিকতা এই মুহূর্তে যেসব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন, সেই চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবিলায় সব সাংবাদিকদের একজোট হওয়া থেকে শুরু করে ভারতীয় সমাজ আজ কী ধরনের বিপদের মুখোমুখি— সেই বিষয়গুলি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন এদিনের বিজয়া সম্মেলনের প্রধান বক্তা ড. জিষ্ণু বসু। আরব সাম্রাজ্যবাদ ও ইভাঞ্জেলিকাল মতবাদের আগ্রাসনের ফলে ব্যাপক ধর্মান্তরণ ও জেহাদি কার্যকলাপের বাড়বাড়ন্ত, পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন, নীতি-আদর্শহীন রাজনৈতিক দলটির সন্ত্রাস, বামপন্থী সংবাদমাধ্যমের দ্বারা কালচারাল মার্ক্সিজমের প্রচারাভিযান, এই ধরনের ধ্বংসাত্মক মতবাদের প্রভাবে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের র‍্যাগিঙের শিকার হওয়া, 'এলজিবিটিকিউআইএপ্লাস'-এর মতো ক্ষতিকর আন্দোলন বা চিন্তাধারার মধ্যে যুবসমাজকে শামিল করার মাধ্যমে ভারতে বেঁচে থাকা সভ্যতা, সংস্কৃতি ও পরম্পরা, মূল্যবোধকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে সক্রিয় আন্তর্জাতিক চক্র—এই সবকিছুর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সাংবাদিকদের ভূমিকা ও দায়িত্বের বিষয়টি তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে সকলকে স্মরণ করিয়ে দেন ড. জিষ্ণু বসু। সব স্তরের সাংবাদিকদের অংশগ্রহণ ও উপস্থিতি, তাঁদের একত্রে আসা, পরস্পর আলিঙ্গন, ভাব বিনিময়, পরিশেষে দ্বিপ্রাহরিক আহারের মধ্য দিয়ে এদিনের বিজয়া সম্মেলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

কাঁচরাপাড়া রেল ইনস্টিটিউটে বিশিষ্ট নাগরিক সম্মেলন

গত ২ নভেম্বর কাঁচরাপাড়া রেল ইনস্টিটিউটে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে বিশিষ্ট নাগরিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে ২৯০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেন। প্রধান অতিথি রূপে ছিলেন দক্ষিণ-পূর্ব রেলের নির্মাণ বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার সুরেন্দ্র কুমার। প্রধান বক্তারূপে ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্রের সহ-ক্ষেত্র প্রচারক জলধর মাহাতো। অনুষ্ঠানে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রপৌত্র শান্তনু চট্টোপাধ্যায়, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ অভিষেক ধর, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রমাপ্রসাদ ঘোষ, বিএসএফ কমাণ্ডান্ট বিজয় কুমার সরকার উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমতী বর্ণালী চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠে বন্দে মাতরম্ সংগীতের পর সম্মেলন সমাপ্ত হয়।

বারো হাজার বছরের প্রাচীন এক নিত্য পূজাস্থল বাঘোর

দেবাশিস চৌধুরী

নৃতাত্ত্বিক মতে আপার প্যালিওলিথিক যুগের শেষ ভাগ অর্থাৎ এখন থেকে আট বা দশ থেকে বারো হাজার বছর আগে যখন হোমো সেপিয়েন্স শিকারি সংগ্রাহক থেকে ধীরে ধীরে কৃষিকার্যে ও পশুপালনে প্রবেশ করছে সেই সময়ে হোমো সেপিয়েন্সের তৈরি বিভিন্ন প্রত্নসামগ্রী অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। মনে রাখতে হবে, তখনও কিন্তু 'ভাষা' পরিপূর্ণ রূপ পায়নি, হোমো

বাঘোর স্টোন

বিদেশ থেকে এবার ভারতবর্ষের দিকে তাকালে দেখা যাবে, আপার প্যালিওলিথিক যুগের প্রত্নস্থল বললে প্রথমেই উঠে আসে মধ্যপ্রদেশের ভীমবেটকার নাম। এই ভীমবেটকা থেকে প্রায় ছয়শো কিলোমিটার পূর্ব দিকে সোন নদের উপত্যকায় ১৯৮০ সাল নাগাদ আবিষ্কৃত হয় আপার প্যালিওলিথিক যুগের একটি প্রত্নস্থল যার নাম বাঘোর। মধ্যপ্রদেশের সিদ্ধি জেলার একটি ব্লকের নাম বাঘোর আর

সেপিয়েন্স শুধুমাত্র 'কথা' বলতে পারতো। এই আপার প্যালিওলিথিক যুগের প্রত্নস্থলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হয়েছে তুরস্কের গোবেকলি তেপে নিয়ে। কিছু গবেষক এই প্রত্নস্থলটিকে উপাসনাস্থল মনে করেন ঠিকই কিন্তু উপাসনার প্রথা কীরকম ছিল, উপাস্য কে বা কারা ছিলেন, তাঁরা পুরুষ নাকি মহিলা, সাকার না নিরাকার তার সঠিক হদিশ দিতে ইতিহাসবিদরা অক্ষম। তাছাড়া এই প্রত্নক্ষেত্রটি আজ সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত অর্থাৎ এই প্রত্নস্থলের উপাসনার ধারাবাহিকতা বহুদিন আগেই লুপ্ত হয়ে গেছে।

এই ব্লকের নামেই প্রত্নক্ষেত্রটির নামকরণ হয়েছে। প্রত্নক্ষেত্রটি তিনটি ভাগে বিভক্ত বাঘোর—১, বাঘোর—২ এবং বাঘোর—৩। আজকের বিষয় শুধুমাত্র বাঘোর—১ কে নিয়ে। কৈমুর রেঞ্জের পাদদেশে ছবির মতো এক গ্রামের নাম কেরাই। এই কেরাই

কেরাই কী মাঈ

গ্রামেই রয়েছে বাঘোর—১ নামক প্রত্নক্ষেত্রটি।

এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটির প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের অধ্যাপক জি আর শর্মা এবং ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির জে ডি ক্লার্কের যৌথ নির্দেশনায় এবং জে এন পাল ও জে এম কেনোয়ারের সহায়তায় ১৯৮০ সাল নাগাদ এই বাঘোর–১ -এ প্রথম খননকার্য চালানো হয়। খননকাজের শুরুতে প্রচুর পরিমাণে পাথরের বর্জ্য এবং তার সঙ্গে নানা রকমের ব্যাকড্ ব্লেড, গ্রাইন্ডিং স্টোন, রিং স্টোন, মাইক্রোলিথ ইত্যাদি বেরিয়ে আসার কারণে প্রথমে মনে হয়েছিল এই জায়গাটি নিছক পাথরের অস্ত্রশস্ত্র তৈরির জায়গা। কিন্তু পরে সব কিছু অপসারিত হলে একটি বৃত্তাকার পাথরের বেদীর দেখা মেলে আর এই বেদীটির উপর বেলেপাথরের তৈরি ত্রিভুজাকৃতির একটি বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়। এটি লম্বায় হাতের তালুর থেকে সামান্য বড়ো, চওড়া হাতের পাঞ্জার মতো, আর উচ্চতা ইঞ্চি দুয়েকের মতো। এই বস্তুটিই 'বাঘোর স্টোন' নামে বিখ্যাত।

এই বাঘোর স্টোনটি যখন উদ্ধার হয় দেখা গেল এটি দুটি টুকরোয় বিভক্ত হয়ে আছে আর গায়ে হলুদ, লাল ও কালো রঙের প্রলেপ রয়েছে। তবে এই হলুদ রংটি বেলেপাথরের স্বাভাবিক রং বলেই মনে হয়। এই ত্রিভুজাকৃতি পাথরটির এক পিঠে আবার জ্যামিতিক আকারে ত্রিকোণাকৃতির নিখুঁত খোদাই করা হয়েছে যার সঙ্গে মিল রয়েছে বর্তমান সময়ের শক্তি-যন্ত্রমের। পাথরটি উদ্ধার করার পর সমস্যা দেখা দিল এটি জোড়া লাগানো নিয়ে। উদ্ধারকারীরা বুঝতে পারছিলেন না কীভাবে জুড়তে হবে। সন্নিকটের কেরাই গ্রামবাসীরা, যাঁরা মূলত কোল ও বৈগা জনগোষ্ঠীর মানুষ তাঁদেরকে সমস্যার কথা বলতেই তাঁরা সমাধান করে দিলেন আর এটাও জানালেন প্রত্নক্ষেত্রটির কাছেই বাঁধানো বেদীর উপর তাঁরা এই ধরনের পাথরে বংশপরম্পরায় পুজো করে আসছেন। এরপর গবেষণাকারী দলটি পাথরটি সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসে এবং পাথরটির স্ট্যাটিগ্রাফি করা হলে জানা যায় এর বয়স ১১,৮৭০ বছর (+/-120 YBP)। এরপর ১৯৮৩ সাল নাগাদ জানানো হয় এই বাঘোর স্টোনটি মাতৃ উপাসনার সঙ্গে সম্পর্কিত।

এখন প্রশ্ন, তাহলে বাঘোর-১ বা কেরাই উপাসনা স্থলে নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা কীভাবে প্রমাণ হচ্ছে? প্রশ্নের উত্তরে যাওয়ার আগে এই প্রতিবেদকের অভিজ্ঞতালব্ধ কিছু কথা না বললে বিষয়টি সম্যক বোঝা যাবে না। আজ থেকে বছর তিনেক আগে যখন প্রথম বাঘোর স্টোনের কথা শুনি তখন থেকেই কেরাই গিয়ে নিজের চোখে সবকিছু দেখার ইচ্ছা হয়। প্রথমে ভেবেছিলাম এটি আমেরিকার কোনো মিউজিয়মে হয়তো আছে। কিন্তু আবার ভাবলাম এতবড়ো একটা প্রত্নবস্তু কি ভারত সরকার বিদেশে যেতে দেবে? এরপর দিল্লি মিউজিয়মে খবর নিই এবং হতাশ হই। এরপর ভাবলাম বিষয়টির সঙ্গে যখন এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটি যুক্ত তাহলে এলাহবাদ মিউজিয়ামে থাকলেও থাকতে পারে। সম্পূর্ণ অনুমানের উপর ভরসা করে অক্টোবর সস্ত্রীক প্রয়াগরাজ রওনা দিই।

চন্দ্রশেখর আজাদ পার্কের পাশে এলাহাবাদ মিউজিয়ামে এসে একজন আধিকারিকের কাছে বাঘোর স্টোন সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে উত্তর এল নেতিবাচক। উনি পরামর্শ দিলেন একবার এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটিতে খোঁজ করে দেখতে। তবে এখানে আসাটা বৃথা যায়নি। বাঘোর–২ অথবা বাঘোর–৩ সাইটের দুটি প্রত্নবস্তু দেখলাম, একটি 30,000 - 15,000 BCE-র বিলুপ্ত প্রজাতির হাতির চোয়ালের ফসিল আর 1.5 Million BCE-এর বাইসনের মাথার ফসিল, যদিও এদের পরিচিতি হিসেবে শুধুই সোন ভ্যালির উল্লেখ রয়েছে। পরের গন্তব্য ইউনিভার্সিটি। মিউজিয়ম থেকে বেশ কিছুটা দূরে ইউনিভার্সিটির দুই নম্বর গেট। গেট দিয়ে ঢুকতে যেতে নিরাপত্তারক্ষীদের বাধা। আসার উদ্দেশ্য বলাতে তাঁদের একজন ভিতরে গিয়ে আমাদের ভিতরে আসার অনুমতি নিয়ে এসে তবে ঢুকতে দিলেন। গেট থেকে সোজা রাস্তা ধরে বেশ কিছুটা হাঁটলে সংস্কৃত বিভাগ আর এই উলটোদিকেই প্রাচীন ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং পুরাতত্ত্ব বিভাগ। বিভাগে ঢোকার সময় আবারও একপ্রস্থ জিজ্ঞাসাবাদ। বিভাগীয় নিরাপত্তাকর্মীদের সন্তুষ্ট করার পর HOD-র সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পেলাম। প্রধান অধ্যাপক এবং আর একজন অধ্যাপক মিলে প্রায় আধঘণ্টার মতো জিজ্ঞাসাবাদ করে আমাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর এন্ট্রি-ফি ও ফোটোগ্রাফি-ফি মিটিয়ে মিউজিয়ামে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। মিউজিয়ামটির দ্বিতলে একটি কাঁচের বাক্সের ভিতর অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে রক্ষিত রয়েছে বিশ্বের প্রাচীনতম শক্তিযন্ত্রম–'বাঘোর স্টোন'।

তিন বছর ধরে খোঁজার পর যখন অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছলাম সেই অনুভূতি প্রকাশ করার মতো ভাষা জানা নেই। দু'হাত জোড় করে অশ্রুসজল চোখে বেশ কিছুক্ষণ শুধু তাকিয়েই ছিলাম। যন্ত্রমটিকে বাক্সের মধ্যে বাঘোর–১ থেকে প্রাপ্ত অন্যান্য প্রত্নসামগ্রীর সঙ্গে রাখা হলেও তা অপেক্ষাকৃত উঁচু পাটাতনে লাল ও কালো রঙের গদির উপর ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে রাখা হয়েছে। এখনও এর গায়ে ফ্যাকাশে হয়ে আসা লাল ও কালো রঙের চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যায়। তবে এটি কিন্তু উপুড় করা অবস্থায় আছে অর্থাৎ এর একটি দিকই দেখা যায়। অপর দিকটি দেখতে হলে মিউজিয়ম গ্যালারির ছবি থেকে দেখতে হবে। উপুড় করে রাখার প্রথম কারণ হিন্দু সনাতন ভাবধারা অনুযায়ী কোনো বাতিল বা খণ্ডিত, মূর্তি হোক বা যন্ত্রম, যা বর্তমানে পূজিত নয় তাকে যদি বিসর্জন না দিয়ে ঘরে রেখে দিতে হয় তো এইভাবেই রাখার নিয়ম। দ্বিতীয় কারণ, যন্ত্রমটি আবিষ্কারের সময় যে অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল ঠিক সেই ভাবেই রাখা হয়েছে। সচক্ষে দেখার পর উপলব্ধি হলো কেন এলাহাবাদ ও ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির গবেষকরা ১৯৮৩ সালে জানিয়েছিল এই পাথরটি মাতৃ উপাসনার সঙ্গে সম্পর্কিত।

৯ অক্টোবর প্রয়াগরাজ পর্ব শেষ করে ১১ অক্টোবর চলে এলাম কেরাই বা বাঘোর–১। কৈমুর রেঞ্জের পাদদেশে এই গ্রামে আমরা দুজনই বোধহয় প্রথম বাঙ্গালি পর্যটক। রাস্তার বাঁদিকে মাঠের মধ্যে

সিমেন্ট বাঁধানো আয়তাকার চাতালের এক প্রান্তে একটি প্রস্তর নির্মিত ফুট দেড়েকের মাতৃমূর্তি যা 'কেরাই কি মাঈ' নামে পরিচিত। এই মূর্তিটির সামনে গোলাকৃতির সিমেন্ট বাঁধানো চাতালের উপর স্তূপীকৃত করে রাখা রয়েছে বিভিন্ন আকৃতির পাথরের ব্লক। প্রতিটি ব্লকের এক পিঠে জ্যামিতিক আকারের খোদাই যেমনটি বাঘোর স্টোনে আছে। একটি ব্লকের সঙ্গে অপর ব্লকের খোদাইয়ের মধ্যে কিন্তু মিলের চেয়ে অমিল বেশি। দেখলে অবাক হতে হয় এখানকার পাথরগুলির গায়ে খোদাই করা জ্যামিতিক আকারগুলি যা একান্তই গুহ্য মাতৃপূজার যন্ত্রমের সঙ্গে সম্পর্কিত। এখান থেকে দক্ষিণ দিকে প্রায় তিনশো মিটার দূরে রয়েছে বাঘোর—১ প্রত্নক্ষেত্রটি। কিন্তু বর্তমানে জায়গাটি জলে পরিপূর্ণ। গরমকালে জল শুকিয়ে গেলে প্রত্নক্ষেত্রটি দেখা যায়। প্রশ্ন হলো, বাঘোর—১ বা কেরাই উপাসনা স্থলে নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা কীভাবে প্রমাণ হচ্ছে? এক কথায় উত্তর দিতে হলে বলতে হয় 'স্থান মাহাত্ম্য'। কালের প্রভাবে বা বিধর্মী আক্রমণে কোনো ধর্মীয় স্থানের বিগ্রহ বা মন্দির যখন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, পরবর্তী সময়ে মূল পরিসরে অথবা সন্নিকটে পুনরায় তা স্থাপিত হলে তখনও কিন্তু তীর্থের আদি মর্যাদা অক্ষুণ্ণই থাকে। উদাহরণস্বরূপ, অযোধ্যার শ্রীরাম মন্দির, গুজরাটের সোমনাথ মন্দির বা কাশীর বাবা বিশ্বনাথ মন্দিরের ইতিহাস দেখলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে। কেরাইয়ের ক্ষেত্রে দুটি সম্ভবনা থাকতে পারে। প্রথমটি হলো আজও যেখানে পূজা হয়ে চলেছে, সেখানেই বাঘোর স্টোনটির পূজা হতো। কোনো একসময়ে তা ভেঙ্গে গেলে বাঘোর—১ প্রত্নস্থলে পাথরটিকে বিসর্জন বা সমাধি দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় সম্ভাবনা হচ্ছে বাঘোর—১ প্রত্নস্থলের ভিতরেই পাথরটির পূজা হতো। পাথরটি ভেঙ্গে গেলে ওইস্থানেই তা উল্টিয়ে বিসর্জিত করে পাশের নতুন স্থানটি পুজোর জন্য নির্বাচন করা হয়েছিল। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, দ্বিতীয় সম্ভাবনাটির সুযোগ বেশি। প্রসঙ্গক্রমে একটি বিষয় মাথায় রাখা জরুরি, বাঘোর স্টোনটির স্ট্র্যাটিগ্রাফি করা হলেও অপর পাথরগুলি যা আজও পূজা হয়ে চলেছে তার কিন্তু স্ট্র্যাটিগ্রাফি করা হয়নি। তাই এই পাথরগুলিও যে বাঘোর স্টোনের সমসাময়িক তা বলা এখনই উচিত হবে না। তবে এরজন্য প্রায় ১২,০০০ বছরের প্রাচীন বিশ্বের প্রথম মাতৃ-আরাধনা স্থলের স্থানমাহাত্ম্য কোনো অংশে ক্ষুণ্ণ হয় না। তুরস্কের গোবেকলি তেপের সঙ্গে আমাদের দেশের কেরাই বা বাঘোর—১ এর এটাই মূল পার্থক্য। যেমন হরপ্পা সভ্যতাতে মন্দির না পাওয়া গেলেও আধ্যাত্মিকতার ছাপ পাওয়া যায়। অথচ সমসাময়িক অন্য সভ্যতায় বড়ো বড়ো স্থাপত্য পাওয়া গেছে। হিন্দু সনাতনী ভাবধারায় আড়ম্বরের থেকে আধ্যাত্মিকতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। তাই বড়ো বড়ো স্থাপত্য অহমিকার প্রতীক হতে পারে, ভক্তির নয়। □

এক আত্মত্যাগের নাম মহাভারতের বর্বরীক

সমাপ্তি সামন্ত

পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের গল্প প্রায় সকলেই জানা। হিড়িম্বা রাক্ষসীর সঙ্গে মহাবলী ভীমের বিবাহের কাহিনিও আমাদের অজানা নয়। যে কাহিনি অজানা, তা হলো ঘটোৎকচের পুত্র বর্বরীক।

বর্বরীক অসীম ক্ষমতার অধিকারী। মহাভারতের যুদ্ধ তিনি কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই শেষ করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। শ্রীকৃষ্ণ সরাসরি বর্বরীককে জিজ্ঞেস করলেন, কতটা সময় লাগবে এই যুদ্ধের পরিণতি আনতে। বর্বরীক শ্রীকৃষ্ণকে জোর হস্তে প্রণাম করে জানালেন, তিনটে তির চালাতে তার যতটা সময় লাগবে মহাভারতের যুদ্ধ শেষ করতে ঠিক ততটাই সময় লাগবে তার। সকলে আশ্চর্য হয়ে এ ওর মুখের দিকে দেখতে লাগলেন। বলে কী বর্বরীক! যে যুদ্ধের জন্য এত প্রস্তুতি, এতো ছলনা, এতো গোপনীয়তা সেই যুদ্ধ মাত্র তিনটে তিরের সাহায্যে সমাপ্ত করতে পারে বর্বরীক। শ্রীকৃষ্ণ প্রমাণ চাইলেন। সঙ্গে তিনি এটাও বললেন, যেন কোনো নিরীহ মানুষের প্রাণ না যায় সে বিষয়েও তাকে নিশ্চিত করতে হবে।

যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়া বর্বরীক তার ক্ষমতা প্রদর্শন করবে কী করে। সামনে একটি বড়ো বৃক্ষ ছিল, নিজের যুদ্ধবিদ্যার কৌশল সেই বৃক্ষের মাধ্যমে দেখাতে সচেষ্ট হলেন বর্বরীক। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, খেয়াল রেখো যেন এই গাছে বসা কোনো পাখি, ফল বা ফুলের ক্ষতি না হয়। মাত্র এই গাছের পাতাগুলি তুমি একটি তিরের সাহায্যে নষ্ট করতে পারবে।

বর্বরীক তার আরাধ্য শ্যামকে স্মরণ করে প্রথম তির নিক্ষেপ করলেন। সেখানে তিনি চিহ্নিত করলেন সেই গাছে থাকা ফুল, ফল ও পাখি যাতে নিশ্চিন্তে থাকতে পারে। তাদের যেন কোনো ক্ষতি না হয়। দ্বিতীয় তির দিয়ে তিনি চিহ্নিত করলেন এই গাছে যতগুলি পাতা আছে সেই পাতাগুলোর নষ্ট করতে। তৃতীয় তিরটা নিক্ষেপ করলেন সেই পাতাগুলিকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেওয়ার জন্য। তখন শ্রীকৃষ্ণ ছলনা করে একটি পাতা তার পায়ের তলায় চেপে রেখেছিলেন। বর্বরীক লক্ষ্য করলেন তার তির গাছের সব পাতা নষ্ট করেও ফিরে আসছে না কেন? কেন সে শ্রীকৃষ্ণের চরণের কাছে এসে অপেক্ষমান। বর্বরীক শ্রীকৃষ্ণের কাছে হাত জোড় করে প্রার্থনা করলেন, প্রভু, আমার এই তির তার কাঙ্ক্ষিত কার্য সমাপ্ত করতে পারছে না। আপনার চরণতলে একটি পাতা অবশিষ্ট থেকে গেছে। আপনি কৃপা করে আপনার পায়ের তলা থেকে ওই পাতাকে মুক্তি দিন। শ্রীকৃষ্ণ বর্বরীকের ক্ষমতা অনুমান করতে পারলেন। বিস্মিত হলেন স্বয়ং ভগবানও। অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বর্বরীক। তবে শ্রীকৃষ্ণকে যে বিষয়টা ভাবিয়ে তুলছে তার হলো, বর্বরীকের মায়ের দেওয়া আদেশ। মাতৃ আদেশ বর্বরীক অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে প্রস্তুত। মা বর্বরীককে বলেছে, সব সময় পরাজিত দলের পাশে থাকতে, তাদের হয়ে লড়াই করতে। এহেন আদেশ ভাবিত করে তুলছে স্বয়ং ভগবানকে। প্রতিদিন যুদ্ধ শেষে যেকোনো একটা দল এগিয়ে থাকবে। অপর দল থাকবে পিছিয়ে। বর্বরীক পিছিয়ে পড়া দলের হয়ে লড়াই করবে। এভাবে তো যুদ্ধের পরিণতি কখনোই হবে না। অনন্তকাল ধরে চলবে এই ধর্মযুদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণ বর্বরীককে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ভয়াবহ রূপ প্রত্যক্ষ করালেন। তার কারণে যুদ্ধে কোনোভাবেই সমতা আনা সম্ভব হচ্ছে না। স্বচক্ষে দেখা এই ভয়ংকর বাস্তবতা ভাবিয়ে তোলে বর্বরীককে। চিন্তায় বিচলিত হয়ে ওঠে তার মন। এই সমস্যার সমাধান কীভাবে সম্ভব? বারবার এই প্রশ্ন করতে থাকে নিজের মনকে।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বর্বরীকের কাছে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটানোর জন্য তার আত্মবলিদান প্রার্থনা করেন। হাসিমুখে শ্রীকৃষ্ণের এই প্রার্থনা মেনে নেয় বর্বরীক। বর্বরীক নিজে বাণ দিয়ে নিজ শিরশ্ছেদ করে শ্রীকৃষ্ণের চরণে নিজমস্তক নিবেদন করেন। তাঁর এই স্বেচ্ছামৃত্যু ভাবিয়ে তোলে সকলকে। পুত্র হারিয়ে শোকে বিহ্বল হয়ে বিলাপ শুরু করেন ঘটোৎকচ। মহাবলী ভীমও প্রপৌত্র হারিয়ে নিজেকে অসহায় মনে করেন।

মহাভারতের যুদ্ধে যোগ দিতে আসার একটাই উদ্দেশ্য ছিল বর্বরীকের। ইচ্ছা ছিল মহাভারতের যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে থাকার। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার সেই ইচ্ছা ব্যর্থ হতে দিতে চান না। যে আত্মবলিদান বর্বরীক দিয়েছে ভগবান তার অন্তিম ইচ্ছা পূরণ করতে বাধ্য হলেন। কুরুক্ষেত্রে এই ভয়াবহ যুদ্ধের একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে বর্বরীকের ছিন্নশির নিজ হস্তে পর্বতের শিখরে স্থাপন করলেন। তিনি কথা দিলেন পৃথিবীতে বর্বরীক খাটু শ্যাম নামে বেঁচে থাকবে। কোনো অসহায় ব্যক্তি যদি খাটু শ্যামের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন তা অবশ্যই পূরণ হবে। পঞ্চপাণ্ডবকে তিনি আশ্বস্ত করেন, এটা বর্বরীকের জীবনের শেষ নয়, এই বলিদানের মধ্য দিয়েই বরং তার জীবনের শুরু। এই শিখরে বসেই মহাভারত যুদ্ধে প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে অমর হয়ে থাকবে বর্বরীক। যে স্বেচ্ছায় নিজমস্তক ঈশ্বরের চরণে অর্পণ করতে পারেন তার বলিদান বিফলে যাবে না। অমর হয়ে থাকবে সে চিরকাল। বর্বরীক খাটু শ্যাম নামে আজও বেঁচে আছেন। মহাভারতের যুদ্ধস্থল কুরুক্ষেত্রে আজও কোনো অসহায় মানুষ বর্বরীকের কাছে প্রার্থনা করলে তা পূরণ করেন বর্বরীক অর্থাৎ খাটু শ্যাম। এই আশীর্বাদ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দিয়েছেন তাঁকে। □

বাঙ্গালির 'আত্মপরিচয়' নিয়ে বিভ্রান্তির অবসানে এক মহাজীবন

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

পিন্টু সান্যাল

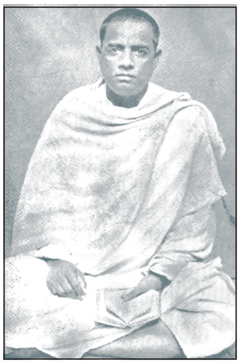

পিতৃদত্ত নাম ভবানী চরণ বন্দোপাধ্যায়। কিন্তু পিতার দেওয়া নামে তাঁকে কেউ চেনে না। শুধু নাম নয়, বারেবারে নিজের উপাসনা পদ্ধতি পালটেছেন। কিন্তু 'হিন্দু' কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম নিয়ে সত্যানুসন্ধানী এই ধর্মতত্ত্ববিদ নিজের পথ বারবার পালটালেও তাঁর প্রখর স্বদেশভক্তি শেষপর্যন্ত তাঁকে হিন্দু জীবন দর্শনের প্রতি আস্থাবান করেছিল। ভারতীয় জীবন পদ্ধতি ও ঐতিহ্যের প্রতি তীব্র অনুরাগ আর দেশের পরাধীনতার বেদনা তাঁকে সেই সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র হিন্দুধর্ম বিশ্বাসেই ফেরত এনেছিল। অবিভক্ত বঙ্গের হুগলি জেলার খান্নান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি। খুব অল্প বয়সেই মাতৃবিয়োগ সহ্য করতে হয়েছিল। স্কটিশ মিশন স্কুল, তারপর হুগলি কলেজিয়েট স্কুল, মেট্রোপলিটন ইন্সটিটিউশন আর তারপর ১৮৮০ সালে জেনারেল অ্যাসেম্বলি ইন্সটিটিউশন যেখানে তাঁর সহপাঠী পরবর্তীকালের স্বামী বিবেকানন্দ। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বন্ধুস্থানীয়, এমনকী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রথম 'বিশ্বকবি' আর 'গুরুদেব' নামে অভিহিত করেন তিনি। ১৯০০ সালের ১ সেপ্টেম্বর তাঁর সম্পাদিত 'Sophia' পত্রিকায় রবীন্দ্র প্রতিভার মূল্যায়ন করে বলেছিলেন—'The World Poet of Bengal'।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গপ্রদেশে জন্ম নেওয়া একগুচ্ছ তারকার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ, কিন্তু বাঙ্গালির আত্মবিস্মৃতির প্রভাব থেকে স্বাভাবিকভাবেই সদা কর্মব্যস্ত এই দেশভক্ত মানুষটিও মুক্ত থাকেন নি। কিন্তু বাঙ্গালিকে নিজের আত্মপরিচয় খুঁজতে হলে, তার বিভিন্ন সমস্যার সমাধান পেতে হলে এই জ্যোতিষ্কদের আলোকেই সম্বল করতে হবে। কলেজে থাকার সময় ১৮৮১ সালে কেশবচন্দ্র সেন ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাবে ব্রাহ্ম হন, তারপর বর্তমান পাকিস্তানের সিন্ধ প্রদেশের হায়দরাবাদ শহরে একটি ব্রাহ্ম বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৮৮৪ সালে কেশবচন্দ্র সেনের দেহত্যাগের পর খ্রিস্টীয় উপাসনাপদ্ধতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ১৮৯১ সালে 'ব্যাপটাইজড খ্রিস্টান' হন, এমনকী বহু বাঙ্গালি শিক্ষিত যুবককেও 'খ্রিস্টান' করেন। ১৮৯৪ সালে নতুন নাম গ্রহণ করেন, যে নামে বাঙ্গালি তাঁকে চেনে— 'ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়' আর নিজেকে 'খ্রিস্টীয় সন্ন্যাসী' হিসেবে ঘোষণা করেন।

এইভাবে বাকি জীবনটা চললে ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের পথিকৃৎদের মধ্যে তাঁর জায়গা হতো না বরং এক পথভ্রষ্ট বাঙ্গালি যুবক হিসেবেই তাঁকে ভুলিয়ে দেওয়া যেত। কিন্তু তীব্র দেশভক্তির যে আলোকশিখা তাঁর ভেতরে জ্বলে উঠেছিল, দেশোদ্ধারের যে বাসনা জেগেছিল তাঁর অন্তরে, তা তাঁকে বারবার এই দেশের ধর্ম-সংস্কৃতিকে জানতে সাহায্য করেছিল। ভবানীচরণের মেধা শুধুমাত্র পুঁথিতেই আবদ্ধ ছিল না; সাঁতার, ক্রিকেট, ফুটবল, জিমন্যাস্টিক তাঁর দৈহিক গঠনকে মজবুত করেছিল। সবে এন্ট্রান্স পাশ করে কলেজে ঢুকেছেন, কিন্তু ইচ্ছা তাঁর যুদ্ধবিদ্যা শেখার— কেন? 'লেকচার না শুনিলে প্রাণটা হাঁপাইয়া উঠিত কিন্তু লেকচার শুনিয়া হাততালি দিয়া যখন বাড়ি ফিরিতাম মনে হইত প্রাণটা যেন খালি খালি ভরে নাই।' শেষে অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করলেন— 'গোয়ালিয়রে গিয়া সৈনিক হইব, যুদ্ধবিদ্যা শিখিব, ফিরিঙ্গি তাড়াইব।' অতএব একজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে সামান্য পুঁজি সম্বল করে গোয়ালিয়রে গিয়ে হাজির হলেন। উদ্দেশ্য 'ভারত উদ্ধার।' খোঁজ করে অভিভাবকরা নিয়ে এলেন মেট্রোপলিটন কলেজে। সেখানেও সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির জাতীয়তাবাদী বক্তৃতা শুনে ঠিক করলেন—'বিবাহ করিব না, বি.এ., এম.এ., পাশ করিব না, প্রাণপণ ভারত উদ্ধার করিব।' সারাজীবন অকৃতদার থেকেছেন আর ভারতোদ্ধারের ব্রততেই মগ্ন থেকেছেন। বয়স যখন ঊনিশ ছুঁই ছুঁই, আবার গেলেন গোয়ালিয়র, উদ্দেশ্য সেই একই। এবার কিছুকাল সাধুসঙ্গে থেকে ফিরে এলেন নিজের গ্রামে। এই অস্থির প্রাণাগ্নি তাঁকে দেশ থেকে দেশান্তরে নিয়ে গিয়েছিল, বিভিন্ন উপাসনা পদ্ধতির অলি গলিতে ঘুরিয়ে শেষে নিয়ে এসেছিল সমস্ত উপাসনা পদ্ধতির প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ বেদান্ত দর্শনের রাজপথে। কলকাতায় থাকার সময় ফরাসি, হিন্দি, সংস্কৃত ভালোভাবে শিখে ফেলেছিলেন, যোগ দিয়েছিলেন কেশবচন্দ্র সেনের 'বাইবেল' ক্লাসে। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় 'জাত-শিক্ষক', সারাটা জীবন শিখেছেন আর শিখিয়েছেন। খন্যানের 'মেমারি স্কুল', কৃষ্ণবিহারী সেনের বাড়িতে 'ঈগলস নেট', সিন্ধু প্রবাসে 'ইউনিয়ন অ্যাকাডেমি' স্কুলে সংস্কৃত পড়ানো ও খেলাধুলা শেখানো, খ্রিস্টীয় উপাসনাপদ্ধতি গ্রহণের পর হায়দরাবাদে CMS স্কুলে শিক্ষকতা, তারপর কলকাতায় ফিরে 'আয়তন'-এর শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। এখানে রবীন্দ্রনাথ আসতেন আর রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে আবাসিক আশ্রম-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা শুনে যুক্ত হন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন— 'তিনি (ব্রহ্মবান্ধব) আমাকে বললেন, এই সংকল্পকে কাজে প্রতিষ্ঠিত করতে বিলম্ব করবার প্রয়োজন নেই। তিনি তাঁর কয়েকটি অনুগত শিষ্য ও ছাত্র নিয়ে আশ্রমের কাজে প্রবেশ করলেন। তখন আমার তরফে ছাত্র ছিল রথীন্দ্রনাথ ও তাঁর

ফঃ ৫

কনিষ্ঠ শমীন্দ্রনাথ। আর অল্প কয়েকজনকে তিনি যোগ করে দিলেন। অধ্যাপনার অধিকাংশ ভার ছিল উপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত রেবাচাঁদ—তাঁর এখনকার উপাধি অনিমানন্দ— বহন না করতেন তাহলে কাজ চালানো একেবারে অসাধ্য হতো। তখন উপাধ্যায় আমাকে যে 'গুরুদেব' উপাধি দিয়েছিলেন আজ পর্যন্ত আশ্রমবাসীদের কাছে আমাকে সেই উপাধি বহন করতে হচ্ছে। এই সঙ্গে উপাধ্যায়ের কাছে আমার অপরিশোধনীয় কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।'

ঠিক এই সময়েই পরিবর্তন আসে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যয়ের জীবনে। বোলপুরের আশ্রম থেকে ফিরে এসে 'হাবড়া ইস্টিশানে' যখন শুনলেন যে তাঁর একসময়ের সহপাঠী 'স্বামী বিবেকানন্দ' 'মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন', সেইসময় যেন ব্রহ্মবান্ধবের ঘরে ফেরার শুরু হলো। যুবক বয়সের 'ফিরিঙ্গি' তাড়াবার জন্য যুদ্ধ শিখতে চেয়েছিলেন, বিবেকানন্দের 'বিশ্ববিজয়' তাঁকে উপলব্ধি করিয়েছিল 'ফিরিঙ্গি' তাড়াবার আর একটা পথ—দেশের স্বাভিমানকে জাগ্রত করা, আপন ধর্ম-সংস্কৃতির মহানতা উপলব্ধি করা। 'বিবেকানন্দ কে' প্রবন্ধে ব্রহ্মবান্ধব লিখছেন—'তবুও যেন একটা প্রেরণা হইল তোমার যতটুকু শক্তি আছে, ততটুকু তুমি কাজে লাগাও। বিবেকানন্দের ফিরিঙ্গিজয় ব্রত উদ্যাপন করিতে চেষ্টা কর। সেই মুহূর্তেই স্থির করিলাম যে, বিলাত যাইব। আমি স্বপ্নেও কখন ভাবি নাই যে বিলাত দেখিব। কিন্তু সেই হাবড়ার ইস্টিশানে স্থির করিলাম– বিলাত গিয়া বেদান্তের প্রতিষ্ঠা করিব। তখন আমি বুঝিলাম বিবেকানন্দ কে? যাহার প্রেরণাশক্তি সাদৃশহীন জনকে সুদূর সাগরপারে লইয়া যায় সে বড় সোজা মানুষ নয়। তাহার কিছু দিন পরেই সাতাইশটি টাকা লইয়া বিলাত যাইবার জন্য কলিকাতা নগরী ত্যাগ করিলাম। অবশেষে বিলাত গিয়া উক্ষপায় (Oxford) বা কামব্রজে (Cambridge) বেদান্তের ব্যাখ্যা করিলাম।'

১৯০২–০৩ সালে বিলাত যাত্রা করে স্বামী বিবেকানন্দের পদাঙ্ক অনুসরণ ঠিক সেই কাজ করলেন যা স্বামী বিবেকানন্দ করেছেন। কিন্তু তার কয়েকবছর আগের ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ছিলেন উলটো পথের পথিক—১৮৯৮ সালে প্রবন্ধ লিখছেন 'Are we Hindus?' নিজেকে 'হিন্দু ক্যাথলিক' বলছেন এমনকী ভারতীয় জীবনের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ চার্চ পদ্ধতি বিকাশের চিন্তায় মগ্ন। দেশোদ্ধারের জন্য সহপাঠীর তীব্র বেদনা তাঁকে ভাবিয়েছিল, এমনকী সঠিক পথ চিনিয়েছিল। তাঁর বিলাতযাত্রার প্রস্তাবনায় কলকাতার আর্চবিশপ লিখছেন—''By means of this statement we declare Brahmabandhab (Theophilus) Upadhyay, a Calcutta Brahmin, to be a Catholic of Sound morals, burning with zeal for the conversion of his compatriots.'' অর্থাৎ ব্রহ্মবান্ধব একজন নিষ্ঠাবান ক্যাথলিক আর স্বদেশবাসীকে মতান্তরিত (Conversion) করার বাসনায় উদগ্রীব। কিন্তু ব্রহ্মবান্ধব যে সত্যিই 'ব্রহ্মের বান্ধব', 'সত্যানুসন্ধানী'—তিনি এতদিনে বিভিন্ন উপাসনার অলিগলি ঘুরে ঘুরে স্বচক্ষে দেখেছেন বেদান্তের রাজপথ।

বিলাত থেকে 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় তাঁর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে চিঠি লিখে দেশবাসীকে জানিয়েছেন ইংরেজদের সভ্যতা-সংস্কৃতি-উপাসনা'র প্রতি তিনি বীতশ্রদ্ধ হয়েছেন আর স্বদেশের ধর্ম-সংস্কৃতির উত্থানের মাধ্যমে ইংরেজদের পরাস্ত করার বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছেন—আমার বিশ্বাস যে ভারত জ্ঞানবলে বিশ্ববিজয়ী হইবে। এই বিশ্ববিজয়ী ইংরেজকে অগ্রে জ্ঞানযোগে জয় করিয়া আমাদের পরাজয়ের প্রতিশোধ লওয়া চাই। (৯ জানুয়ারি ১৯০৩)।

একসময় যিনি মূর্তি পূজা ও প্রকৃতি পূজার তীব্র বিরোধী ক্যাথলিক মতের অনুসারী ছিলেন তিনি বিলাত প্রবাসী সন্ন্যাসীর চিঠিতে লিখছেন কীভাবে প্রকৃতির বিভিন্ন রূপের সাধনতত্ত্ব সেই দেশের পাদরিদের বুঝিয়ে সন্তুষ্ট করেছেন—

''রূপকে সাধন-সামগ্রী না করিলে প্রবৃত্তির তাড়না হইতে বাঁচা দায়। ইংরেজরা প্রকৃতির রূপকে ভালবাসে কিন্তু রূপের সাধন জানে না। নব্য সভ্যতার শাস্ত্রে প্রকৃতির সৌন্দর্যকে উচ্চস্থান দেওয়া হইয়াছে বটে কিন্তু তাহাতে পবিত্রতার বা মঙ্গল ভাবের আরোপ নাই। প্রকৃতির মাধুরী লইয়া কত না গীত, কত না গাথা। কিন্তু যে সকল বস্তু আত্ম ও কল্যাণময় তাহার আদর নাই। ক্রোটন আর অর্কেরিয়া লইয়াই ব্যস্ত। অশ্বত্থ বা কদলী বা বিশ্বতরুর কোনো সম্মান নাই। প্রকৃতি কেবল সম্ভোগের বিষয় হইয়াছে। তাহার মঙ্গলময় রূপ তিরস্কৃত হইয়াছে। আর এদেশে সম্ভোগের ভাব অতিক্রম করিয়া প্রকৃতিতে মঙ্গলভাব দেখা সুকঠিন ব্যাপার। ছয় সাত মাস স্বভাব যেন একেবারে মৃতপ্রায়। তার পরে সৌন্দর্যে ফেটে পড়ে। এতদিন সংযমের পর যদি গোটাকতক দিন আমোদের সময় মাধুর্য সম্ভোগ না করা যায় তাহলে জীবন অসহনীয় হইয়া উঠিবে। আমার রূপের পূজার ব্যাখ্যা শুনিয়া এক মস্ত অধ্যাপক পাদরি আমায় লিখিয়াছেন যে রূপসাধনের তত্ত্ব অতি গম্ভীর ও মনোহর। এরা অনেকে মনে করেন যে যদি ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে এই হিন্দুভাব নষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলে জগতের ঘোর অনিষ্ট হইবে। শুধু ইংরেজ জাতিকে পযুদস্ত করতে নয় বরং ইরেজদের কল্যাণের জন্যেও ভারতকে আত্মবিস্মৃতি থেকে উদ্ধারের কথা বলেছেন— ''ভারতের আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়াছে তাই আজ অর্দ্ধশিক্ষিত ইংরেজ ভারত-বাসীদিগকে কাউপার ও পোপ মুখস্থ করাইয়া সাহিত্য শিখাইতেছে ও মারটিনোর ব্যাখ্যা করিয়া দর্শনশাস্ত্র উপদেশ দিতেছে। ইহা অপেক্ষা লজ্জাকর বিষয় আর কী আছে। এই আত্মবিস্মৃতি কীসে যায়। আমি ভাবিলাম আমাদের শাস্ত্রবিদ্যা শিখিতে ইংরেজের যদি আগ্রহ হয় তাহা হইলে ভারতের আত্মবিস্মৃতি দূর হইবে ও ইংরেজরাও মঙ্গল হইবে''।

ইংল্যান্ড থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর ব্রহ্মবান্ধব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন—'মহামায়ার কৃপায় আমি দেশে ফিরে এসেছি। বেঁচে গেছি হাড় জুড়িয়েছে। কী আড়ষ্ট হোয়েই না বিলেতে থাকতে হোতো। সকাল বেলা বুট সুট এ'টে শয়ন-ঘর থেকে যে বেরুনো-আবার সেই শোবার সময় রাত্রিতে রাজ-সাজ খোলা। সমস্ত দিন মোজাবন্ধ, কোমরবন্ধ, গলাবন্ধ প্রভৃতি নানারূপ বন্ধে প্রাণ ওষ্ঠাগত।'

সত্যিই তিনি বন্ধনমুক্ত হয়েছিলেন, বিদেশীয় সভ্যতা-উপাসনার অনুকরণ থেকে মুক্ত হয়ে দেশসেবায় ব্রতী এক নতুন সন্ন্যাসীকে পেল ভারতবর্ষ।

'The Concord', 'The Harmony', 'Sindh Times',

'Sophia' ইত্যাদি পত্রিকার সম্পাদনা তার বিলাত যাত্রার আগের পর্ব, বিলাতফেরত সন্ন্যাসী বঙ্গে এসে দেখলেন জাতীয়তাবোধের ঢেউ। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রাক মুহূর্তে আত্মপ্রকাশ করলো ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' পত্রিকা। এটিই প্রথম বাংলা পত্রিকা যা সর্বসাধারণের মধ্যে সহজবোধ্য রূপে রাষ্ট্রীয় চিন্তা প্রচার করে, সমাজের সব স্তরে পৌঁছে গণশক্তির জাগরণ করে। ১০ মার্চ ১৯০৭ থেকে 'স্বরাজ' নামের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করলেন যার ভাষাশৈলী বিদগ্ধ মানুষদের উপযোগী; সেই পত্রিকার শিরোদেশে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের আবক্ষ ছবি যেন শিবাজী মহারাজের 'হিন্দবী স্বরাজে'র স্বপ্নকে মনে করাতো। তাঁর 'এখন থেকে গেছি প্রেমের দায়ে' প্রবন্ধের জন্য 'সন্ধ্যা' পত্রিকার বিরুদ্ধে ১৯০৭ সালের ১০ সেপ্টেম্বর রাজদ্রোহের মামলা শুরু হয়। ২৩ সেপ্টেম্বর আদালতে ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের সামনে নিজের বিবৃতিতে 'ভারতের উন্নতিতে পথের কাঁটা' ইংরেজদের সামনে নিজের পক্ষে যুক্তি রাখতে অসম্মত হলেন—"I accept the entire responsibility of the public-cation, management and conduct of the newspaper Sandhya and I say that I am the writer of the article, Thake Gachi Premer Dai which appeared in the Sandhya of the 12th Auguts 1907, beingone of the articles forming the subject matter of this prosecution. But I do not want to take any part in this trial because I do not believe that in carrying out my humble share of the God-appointed mission of Swaraj, I am in any way accountable to the alien people who happen to rule over us and whose interest is and must necessarily be in this way of our true national development"—এরপর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আর তাঁর পক্ষের কৌসুলি হওয়ার প্রয়োজন থাকলো না।

মামলা চলার সময় ক্রমাগত দাঁড়িয়ে থাকার ফলে পুরনো 'হার্নিয়া' রোগের প্রকোপ বাড়তে থাকায় হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। তাঁর মৃত্যুর ১ দিন আগে অর্থাৎ ২৬ অক্টোবরেও তাঁর বিরুদ্ধে আবার রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হয় আর ওইদিন ব্রহ্মবান্ধব 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় লেখেন—"আমি ফিরিঙ্গিদের জেলে বন্দি হয়ে কাজ করতে যাব না... আমি কখনও কারও আদেশে চলিনি, কারও কথা মানিনি। বার্ধক্যের এই শেষ প্রান্তে তারা আমাকে আইনের নামে জেলে পাঠাবে, আর আমি বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করব—অসম্ভব! আমি জেলে যাব না, আমাকে ডাকা হয়ে গেছে"। তাঁর শিষ্য অনিমানন্দ 'The Blade' পত্রিকায় তাঁর শবযাত্রায় বিবরণ দিয়ে লেখেন যে 'সন্ধ্যা' পত্রিকার কার্যালয় থেকে নিমতলা ঘাট পর্যন্ত প্রায় দশহাজার মানুষ তাঁর শবযাত্রায় অংশগ্রহণ করে।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের শেষকৃত্য সম্পূর্ণ হিন্দু রীতি অনুযায়ী হয়, তাঁর ভাইপো চিতায় আগুন দিয়ে ব্রহ্মলীন করেন।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের জীবন স্বদেশভক্তির আলোয় এক পথভ্রষ্ট বাঙ্গালির ঘরে ফেরা, কর্মে ফেরা ও ধর্মে ফেরার কাহিনি। যিনি যৌবনে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাতের পরেও কেশবচন্দ্র সেনের অনুগামী। পরবর্তীকালে লিখছেন—"রাজা রামমোহন ও কেশবচন্দ্র সমন্বয়বাদী ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা ছিল না। তাই তাঁহারা পরস্ব আহরণ করিতে গিয়া কতকটা নিজস্ব হারাইয়াছিলেন। কর্ণধারের অভাবে অনেকেই নূতন ভাবের তরঙ্গে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন। এই বিপ্লবে সমাজ-ভঙ্গ রোধ করিবার জন্য ভগবান রামকৃষ্ণের আবির্ভাব। রামকৃষ্ণ তাঁহার সাধনের বলে এক অপূর্ব্ব সমন্বয়ের পন্থা খুলিয়া দিয়াছেন। ওই পন্থা ধরিলে গৃহচ্যুত হইতে হয় না অথচ পরকে আত্মীয় করিয়া লওয়া যায়। নবাগত শক্তি ও ভাবসকলকে অগ্রাহ্য করিলে বাঁচিতে পারা যাইবে না। উহারা তোমায় গৃহ হইতে টানিয়া বাহির করিবে। গৃহস্থ হইয়া অভ্যাগতদিগের যথাবিধি আদর করিতে হইবে। ইহাই খাঁটি হিন্দুর লক্ষণ। ভগবান রামকৃষ্ণ খাঁটি হিন্দু সাধক ছিলেন। আগন্তুক ভাববিরোধগুলি ব্রহ্ম-বিজ্ঞানে মিলিত করিয়া লোকরক্ষার উপায় করিয়া গিয়াছেন। রামকৃষ্ণ এই শতাব্দীর লোকরক্ষার সেতু।"

যিনি একসময় কেশবচন্দ্র সেনের প্রেরণায় 'বাইবেল' পাঠ করছেন, তিনিই 'ঐতিহাসিক বিচার' প্রবন্ধে লিখছেন---"সাহেবপ্রচারকদিগের একান্ত বাসনা যে, 'যেন তেন প্রকারেণ' তাহাদের জিশুকে এদেশে প্রবেশ করাইয়া দেন। কিন্তু কিছুতেই আর পারিতেছেন না। তাঁহারা জাতিধর্ম নষ্ট করিয়া বহির্মুখী সভ্যতার চাকচিক্য দেখাইয়া ভেদবুদ্ধি ও প্রবৃত্তিমার্গের শিক্ষা বিস্তার করিয়া কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয় করিয়া বিষণ্ণ প্রযত্ন হইয়াছেন। অবশেষে নিরাশ হইয়া শস্ত্রের দোহাই দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। গীতাকে কোন্ হিন্দুসন্তান না মানে! যদি প্রমাণ করা যায় যে, গীতাশাস্ত্র, জিশুখ্রীষ্টেরই পূজা করিয়াছে, কৃষ্ণের নহে—তাহা হইলে হিন্দুবিজয় অবাধে হইয়া যাইবে। দুঃসাহস তো অল্প নয়। বাল গঙ্গাধর তিলক, ঋষি অরবিন্দ, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতোই পরবর্তীকালে ব্রহ্মবান্ধব বুঝেছিলেন 'শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব' ব্যাখ্যার মাধ্যমেই বিদেশীয় উপাসনা-সংস্কৃতির দাসত্ব থেকে দেশবাসীকে মুক্ত করা সম্ভব—"অবতরণ সম্বন্ধে গীতার শিক্ষা-আর, খ্রীষ্টিয়ানদিগের শিক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। গীতা, শিক্ষা দেন ভাগবান, দুষ্কৃতদিগের শাসনার্থ, সাধুদিগের পরিত্রাণার্থ ও ধর্মসংস্থাপনার্থ যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। কিন্তু কুষ্টিয়ানেরা বলেন যে ভগবান, একবারমাত্র মনুষ্য প্রকৃতি ধারণপূর্বক পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রাণদান করিয়াছেন। গীতার শিক্ষানুসারে অবতার শব্দগ্রহণ করিলে, জিশু, অবতারপদবাচ্য হইতে পারেন না। তাঁহার আবির্ভাবতত্ত্ব, সম্পূর্ণ অন্যপ্রকার। পর্কহার প্রমুখ ধর্মপ্রচারকগণ জিশুকে গীতার ভিতর দিয়া ভারতে প্রবিষ্ট করাইবার যে উদ্যোগ করিতেছেন, তাহা সর্বশাস্ত্রবিরোধী। নিশ্চিতই গাঢ় অজ্ঞানাচ্ছন্ন না হইলে, কেহ এরূপ হাস্যোদ্দীপক চেষ্টায় বিব্রত হয় না।"

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের জীবনের মধ্যে 'বাঙালি' নিজের জাতীয় জীবনকে তুলনা করতে পারে। বিদেশীয় শাসক আর তারপর বিদেশীয় মতবাদ 'বাঙালি'কে যে মানসিক দাসত্বের শিকলে আবদ্ধ করেছে, তাঁকে আপন সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে আপন বাসভূমি থেকেও ঘরচ্যুত করেছে, 'সাংস্কৃতিক উদ্বাস্তু'তে পরিণত করেছে তা থেকে বাঙ্গালির জাতীয় জীবনকে ঘরে ফেরাতে হলে 'স্বদেশপ্রীতি' আর 'হিন্দু ধর্মবোধ' এর অভিন্নতা বুঝতে হবে আর ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের জীবন সেই চেষ্টায় সহায়ক হতে পারে। □

বিহারের নির্বাচন থেকে পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল শিক্ষা নেবে কি?

প্রদীপ মারিক

বিহারবাসী প্রমাণ করলো এসআইআর প্রকৃত গণতান্ত্রিক অধিকার। তাঁরা ভোটদান করে পুনর্নির্বাচিত করলেন এনডিএ জোটকে। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান আঞ্চলিক শাসক দলকে বিহারবাসী দেখিয়ে দিলেন ভোটদান যেমন প্রত্যেক ভারতবাসীর অধিকার, তেমনি ভুয়ো ভোটার বাদ দেওয়াও ভারতবাসীরই দাবি। কারণ অনুপ্রবেশ বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নোটবন্দির মতো এসআইআর-কে 'ভোটবন্দি' আখ্যা দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের শাসক দলের প্রধান নেত্রী। তিনি বলেছেন, 'বিজেপির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার এসআইআর-এর নামে জনগণকে হয়রানি করছে। যেমন ছিল নোটবন্দি, তেমনই এসআইআরও হলো 'ভোটবন্দি'। এটি যেন একপ্রকার অঘোষিত জরুরি অবস্থা।' তিনি আরও অভিযোগ করেছেন, 'প্রশাসনের অফিসার-কর্মীদের এভাবে ব্যস্ত রাখা হচ্ছে।'

দীর্ঘমেয়াদি একটা লাভের জন্য প্রাথমিক কিছু সমস্যা কাটিয়ে যাতে সক্রিয় ভাবে এসআইআর কাজ হয়, সেটা না ভেবেই পশ্চিমঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কী করে বলে দিলেন এসআইআর সুপার ইমার্জেন্সি। রাজ্যবাসীই প্রমাণ করবেন তাঁর ধারণা বা তাঁর কথার কোনো মূল্য নেই। বিহারের মতোই ছাব্বিশে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা লাভ করবে বিজেপি। পশ্চিমবঙ্গের এই পড়শি রাজ্যের মানুষ পুনরায় ভরসা রাখলেন নীতীশ কুমারের নেতৃত্বের উপরেই। ২৪৩টি আসনের মধ্যে ২০২ আসনে এনডিএ-কে জিতিয়ে বিহারের ক্ষমতায় ফিরেই অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণীর (ইসিবি) প্রত্যেক নাগরিককে ১০ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা দেবে। পাশাপাশি, এক কোটি সরকারি চাকরি, প্রতিটি জেলায় মেগা স্কিল সেন্টার, 'লক্ষপতি দিদি' প্রকল্পের মাধ্যমে এক কোটি মহিলাকে আর্থিক সহায়তা এবং শহরাঞ্চলের মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য 'মিশন কোটিপতি' চালুর আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। নাগরিকের জীবনযাত্রার মনোন্নয়নের কথা ভেবেছে বিহার সরকার। বিহারে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেছে, ভবিষ্যতেও তা চালিয়ে যাবে। কৃষক, মহিলা, পিছিয়ে পড়া সমাজ ও অন্যান্য সকল শ্রেণীর উন্নয়নই এনডিএ-র লক্ষ্য। এনডিএ অতীতে মানুষের পাশে থেকেছে, ভবিষ্যতেও থাকবে।

পাটনার পাশাপাশি আরও চারটি শহরে চালু হবে মেট্রো পরিষেবা। এছাড়া রাজ্যে ১০টি নতুন শিল্প পার্ক গড়ে তোলা হবে এবং এনডিএ সরকার গঠন করে আগামী পাঁচ বছরে ৫০ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার লক্ষ্য নিয়েছে। 'ভোকাল ফর লোকাল' উদ্যোগের অধীনে ১০০টি এমএসএমই পার্ক তৈরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছে রাজ্য সরকার। পাশাপাশি 'মেড ইন বিহার' প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষিজ পণ্যের রপ্তানি দ্বিগুণ করার পরিকল্পনাও জানানো হয়েছে। গিগ কর্মী ও অটোচালকদের জন্য আর্থিক সহায়তা ও স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে বলেও ঘোষণা করেছে এনডিএ জোট।

বিহারবাসী দেখিয়ে দিলেন ভোট একটা উৎসব এবং এজন্য এসআইআর কেন প্রয়োজন। ভারতীয় নির্বাচন কমিশন ভোটের আগেই প্রকাশ করেছিল যে বিহার রাজ্যে ৫২.৩ লক্ষেরও বেশি ভোটার তাদের নিবন্ধিত তালিকায় নেই। ১০ জুলাই, সুপ্রিম কোর্ট সুপারিশ করেছিল যে ভারতের নির্বাচন কমিশন আধার, ভোটার কার্ড এবং রেশন কার্ডকে তালিকা আপডেট করার জন্য বৈধ নথি হিসেবে বিবেচনা করার কথা। সুপ্রিম কোর্ট বিহারে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) নিয়ে নির্বাচন কমিশনকে এগিয়ে যাওয়ার স্বীকৃতি জানায়। বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ার পরে বিহারের খসড়া ভোটার তালিকা থেকে যাদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছিল, সেই ৬৫ লক্ষ ভোটারের তালিকা নির্বাচন কমিশন ১ আগস্ট আপলোড করেছে। ২০২৫ সাল পর্যন্ত বিহারের ভোটার তালিকায় যাদের নাম ছিল কিন্তু খসড়া তালিকা থেকে বাদ পড়েছিল, তাদের তালিকা বিহারের প্রধান নির্বাচন অধিকর্তার (সিইও) অফিসের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে পোস্ট করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, বিহারে শেষবার ২০০৩ সালে এসআইআর পরিচালিত হয়েছিল। ৩১ দিনের মধ্যে পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল। আধুনিক প্রযুক্তি ছাড়াই তখন এই কাজ সম্পন্ন হয়। এরপর ২০০৫ সালে নির্বাচনের আগেই তালিকা তৈরি করা হয়েছিল। তখন পাটনায় প্রায় ৭০ হাজার ভুয়ো নাম পাওয়া গিয়েছিল, তখন অপরাধমুলক মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদেরও তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। বিহারের এনডিএর এই জয় একপ্রকার গণতান্ত্রিক অধিকারের জয়।

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতন্ত্রের পূজারি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সমগ্র ভারতবাসীর স্বপ্নাতীত ইচ্ছা এক পৃথিবী, এক বিশ্ব, এক পরিবার, এক ভবিষ্যৎ যা সমগ্র বিশ্বকে 'সন্ত্রাসবাদ' নামক শব্দটাই মূল থেকেই উৎপাটিত করতে পারবে। বিহারবাসীর সুশৃঙ্খল জনমতের রায় আবারও বুঝিয়ে দিল ভারতবাসী শান্তির পক্ষে। কোনো দল নির্বাচিত হবে, কিংবা পরাজিত হবে কিন্তু জয় হবে গণতন্ত্রের। বিহার বিধানসভা নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাশীল আঞ্চলিক দলকে শিক্ষা দিয়ে গেল যে নির্বাচন লড়তে দেশবাসীর মূল্যবান ব্যালট দরকার, বুলেট নয়। বিহারবাসীদের জন্য ডাবল ইঞ্জিন সরকার আবারও একবার প্রতিষ্ঠিত হলো।

পরিবেশবান্ধব অর্থনীতিতে ভারতের অবস্থান

সংস্কৃতি, নীতি ও অর্থনৈতিক রূপান্তর

ড. জয়ন্ত চৌধুরী

কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) নির্গমনের তথ্য (যেমন : কাতার ৩১.৭, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৩.০ মেট্রিক টন) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ভারত (১.৬ মেট্রিক টন) মাথাপিছু নির্গমনে বিশ্বের গড় (৪.৩ মেট্রিক টন) থেকে অনেক নীচে অবস্থান করছে। এই তুলনামূলকভাবে কম দূষণের মাত্রা ভারতের নাগরিকদের মিতব্যয়ী জীবনধারা, গভীর সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং সরকারের দৃঢ় প্রতিশ্রুতির সমন্বিত ফল।

১. পরিবেশ সুরক্ষায় সনাতন সংস্কৃতির ভিত্তি : নাগরিক সহযোগিতা ভারতের কম কার্বন ফুটপ্রিন্টের ভিত্তি নিহিত রয়েছে প্রাচীন হিন্দু সাংস্কৃতিক চর্চা ও দার্শনিক নীতিতে, যেখানে প্রকৃতিকে কেবল ব্যবহারের বস্তু হিসেবে নয়, বরং পবিত্র ও দেবতুল্য হিসেবে সম্মান করা হয়।

- **বৃক্ষ পূজা ও সংরক্ষণ :** তুলসী, বট ও অশ্বত্থের মতো গাছকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে রক্ষা করা এবং পূজা করা হয়। এই প্রথা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বৃক্ষ সংরক্ষণকে উৎসাহিত করে এবং বন উজাড় রোধে পরোক্ষভাবে সহায়তা করে। বিগত কয়েক বছরে পর্যাবরণ সংরক্ষণের প্রয়াসের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া একটি সামাজিক আন্দোলনের পথে চলতে শুরু করেছে।
- **অহিংসা ও খাদ্যাভ্যাস :** 'অহিংসা পরমো ধর্ম' নীতিটি নিরামিষ খাদ্যাভ্যাসকে উৎসাহিত করে। বিশ্বের মাংস শিল্প যেখানে ব্যাপক কার্বন-নিবিড়, সেখানে এই খাদ্যাভ্যাস কম কার্বন-নিবিড় খাদ্যশৃঙ্খল বজায় রেখে পরিবেশের উপর চাপ কমায়।
- **মিতব্যয়িতা ও পুনর্ব্যবহার :** পরম্পরাগত ভারতীয় সংস্কৃতিতে 'অপরিগ্রহ' (অতিরিক্ত সংগ্রহ না করা) এবং পুরোনো জিনিসের পুনঃব্যবহারের অভ্যাস দৈনন্দিন জীবনে বর্জ্য উৎপাদন ও সম্পদের ব্যবহারকে সর্বনিম্ন রাখে। এই প্রসঙ্গে রিডিউস, রিইউজ, রিফিউজ পদ্ধতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই সাংস্কৃতিক প্রথাগুলি বৃহত্তর জনগণের মধ্যে একটি স্বেচ্ছামূলক নাগরিক সহযোগিতা তৈরি করে, যা সরকারি নীতির সাফল্যের জন্য একটি মজবুত সামাজিক ভিত্তি প্রদান করে।

২. প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন সরকারের উদ্যোগ ও লক্ষ্যমাত্রা সাংস্কৃতিক সচেতনতাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে ভারত সরকার একাধিক যুগান্তকারী পরিবেশ নীতি গ্রহণ করেছে।

- **নেট জিরো লক্ষ্যমাত্রা :** গ্লাসগোতে COP26-এ ঘোষিত 'পঞ্চামৃত' অঙ্গীকারের মাধ্যমে ২০৭০ সালের মধ্যে নেট জিরো কার্বন নির্গমনের উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।
- **শক্তি সক্ষমতা বৃদ্ধি :** ২০৩০ সালের মধ্যে নন-ফসিল জ্বালানি থেকে ৫০০ GW বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা অর্জনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।
- **লাইফ মিশন :** পরিবেশের জন্য জীবনধারা বা 'Lifestyle for Environment' এই মিশন বিশ্ব মঞ্চে ভারতের ঐতিহ্যবাহী মিতব্যয়ী জীবনশৈলীকে টেকসই ব্যবহারের মডেল হিসেবে তুলে ধরে।
- **জাতীয় সবুজ হাইড্রোজেন মিশন :** এই উদ্যোগের মাধ্যমে ভারত ২০৩০ সালের মধ্যে সবুজ হাইড্রোজেন উৎপাদন ও রপ্তানির কেন্দ্রে পরিণত হতে চাইছে, যা শিল্প পরিবহন ক্ষেত্রে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমাবে।

৩. পরিবেশবান্ধব উদ্যোগের অর্থনৈতিক প্রভাব ও বর্তমান চিত্র। এই পরিবেশবান্ধব উদ্যোগগুলির অর্থনৈতিক প্রভাব সুদূরপ্রসারী, যা জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনছে।

- **বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান :** পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিখাতে বিপুল দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আসছে, যা অর্থনীতিকে চাঙ্গা করছে এবং এই খাতে নতুন 'সবুজ কর্মসংস্থানের' সুযোগ তৈরি হচ্ছে।
- **জ্বালানি নিরাপত্তা ও আমদানি ব্যয় হ্রাস :** দেশীয় শক্তি (বিশেষত সৌর ও বায়ু) উৎপাদনে বৃদ্ধি পাওয়ায় কয়লা ও অপরিশোধিত তেলের ওপর আমদানি নির্ভরতা কমবে, ফলে বিপুল পরিমাণ বিদেশি মুদ্রা সাশ্রয় হবে এবং দেশের বাণিজ্য ঘাটতি নিয়ন্ত্রণে আসবে।
- **প্রযুক্তিগত স্বনির্ভরতা :** উৎপাদন-ভিত্তিক প্রণোদনা প্রকল্প (PLI Scheme) সৌর প্যানেল, ব্যাটারি এবং গ্রিন হাইড্রোজেন প্রযুক্তির স্থানীয় উৎপাদন বাড়িয়ে ভারতকে সবুজ প্রযুক্তির উৎপাদন কেন্দ্রে পরিণত করতে সাহায্য করছে।
- **জনস্বাস্থ্য সুবিধা :** বায়ু দূষণ হ্রাস পাওয়ায় স্বাস্থ্যখাতে সরকারি ও ব্যক্তিগত ব্যয় কমবে এবং নাগরিকদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

ভারতের নবীকরণযোগ্য শক্তির বর্তমান পরিসংখ্যান (২০২৫)

সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, ভারতের পরিবেশবান্ধব উদ্যোগগুলি দ্রুত ফল দিচ্ছে :

- **মোট সক্ষমতা (Total Capacity) :** নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত, ভারতের মোট নবীকরণযোগ্য শক্তির সক্ষমতা (Large Hydro -সহ) ২৫০ GW অতিক্রম করেছে।
- **অ-জীবাশ্ম শক্তির ভাগ :** ভারতের মোটা বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতার ৬০ শতাংশেরও বেশি এখন অ-জীবাশ্ম জ্বালানি উৎস (যেমন, সৌর, বায়ু, জলবিদ্যুৎ এবং পারমাণবিক শক্তি) থেকে আসছে, যা ২০৩০ সালের লক্ষ্যের চেয়ে কয়েক বছর আগেই অর্জিত হয়েছে।
- **বিশ্বের অবস্থান :** ভারত বর্তমানে মোট নবীকরণযোগ্য শক্তি সক্ষমতায় এবং বায়ু শক্তিতে বিশ্বে চতুর্থ এবং সৌর শক্তি সক্ষমতায় তৃতীয় স্থানে রয়েছে।

উপসংহারে বলা যায়, ভারতের কম মাথাপিছু কার্বন নির্গমন একটি সাংস্কৃতিক সাফল্য, নাগরিক সচেতনাতা এবং সরকারি দূরদর্শিতার প্রতিফলন। এই নীতিগুলি পরিবেশ সুরক্ষার পাশাপাশি ভারতকে একটি শক্তিশালী, স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সবুজ অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করছে, যা বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অনুকরণীয় মডেল হিসেবে কাজ করছে। □

ফেলে দেওয়া কলমে বিষাক্ত হচ্ছে পরিবেশ

১৮৮৩ সাল। আমেরিকার লুইস ওয়াটারম্যান আবিষ্কার করলেন ফাউন্টেন পেন। ফাউন্টেন পেনের এই আবিষ্কার কলমের জগতে বিপ্লব এনে দিল। খাগের কলম বা পাখির পালক দোয়াতের কালিতে চুবিয়ে লেখার দিন শেষ হয়ে গেল। আমেরিকাতে

এই কলমের উৎপাদন শুরু হলেও পরবর্তীকালে কোম্পানিটি গড়ে ওঠে ফ্রান্সের রাজধানী শহর প্যারিসে। এরপর কলমের বিবর্তন হতে থাকল। কলমের গঠনের বিবর্তন, নিবের বিবর্তন। রূপে-গুণে বৈচিত্র্যময় হতে শুরু করল। ধীরে ধীরে কলম ও কলমের নিবে সোনা ও হীরের ব্যবহার তাকে আরও বিলাসবহুল ও আকর্ষণীয় করে তুলল। কলম হয়ে গেল আভিজাত্যের প্রতীক। কলমের খোঁচায় যুগের পরিবর্তন আসতে শুরু করল। বলা হলো, তলোয়ারের চাইতে কলমের শক্তি বেশি।

কিন্তু কলমের এই সোনালি দিন আজ হারিয়ে যাওয়ার পথে। স্বাক্ষরের প্রয়োজন ছাড়া ব্যবহারিক জীবনে কলম তেমন কাজে লাগে লাগে না। পাতার পর পাতা লিখে দেওয়া যায় ডিজিটাল নোটবুকে শুধুমাত্র ভার্চুয়াল কি-বোর্ড ব্যবহার করে। এমনকী কথা শুনে তা লেখায় রূপান্তর করে দেওয়ার মতো সফটওয়ারও প্রচুর রয়েছে। ডিজিটাল বোর্ডে লেখার কলমের ধরনও অন্যরকম। দেখতে হয়তো কলমের মতো কিন্তু কাজ একেবারে ভিন্ন। চিঠিপত্রের দিন তো কবেই শেষ হয়ে গেছে। তার পরিবর্তে এসেছে ই-মেল, হোয়টস্‌অ্যাপ, মেসেজ, কত কী।

আগে যেমন মানুষের জামার বুকপকেটে সুন্দর সুন্দর কলম শোভা পেত, এখন আর তেমন দেখতে পাওয়া যায় না। অনলাইন পরীক্ষা ব্যবস্থায় কলম লাগে না। কি-বোর্ডে টাইপ করে উত্তর লিখতে হয়। হয়তো এমন একদিন আসবে যখন পড়ুয়াদেরও কলম ব্যবহারের প্রায়োজন থাকবে না। প্রযুক্তির অবদানে কলম এখন 'ইউজ অ্যান্ড থ্রো'। এরকম একটি প্লাস্টিক কলমের দাম দু'টাকা থেকে তিনটাকা। রিফিল করার ঝামেলা নেই। ব্যবহার করার অনেক সুবিধা। কালি শেষ হয়ে গেলে যেখানে খুশি সেখানে ফেলে দিলেই হয়।

বিপদটা এখানেই। যেখানে-সেখানে ফেলে দেওয়া প্লাস্টিকের বিষে বিষাক্ত হচ্ছে পরিবেশ। ভাঙানির ব্যবসা যারা করেন তাঁরাও ফেলে দেওয়া প্লাস্টিকের কলম কিনতে চান না। কারণ এতে তাদের লাভ তেমন নেই। কদাচিৎ কেউ কিনতে চাইলে কেজি প্রতি একটাকা থেকে দু'টাকা দিতে রাজি হন। স্বাভাবিকভাবেই এত অল্প টাকার জন্য কেউ আর যত্ন করে কলমগুলো গুছিয়ে তুলে রাখেন না। যার ফলে ফেলে দেওয়া কলমগুলি পুনরায় ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা সম্ভব হয় না।

পড়ুয়াদের কলমের প্রয়োজন হয় বেশি। এবছর পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে ৯ লক্ষ ৮৪ হাজার ৭৫৩ জন। একটি কলম একজন ছাত্রের গড়ে দু'সপ্তাহ চললে এবছরে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের প্রায় আড়াই কোটি কলমের প্রয়োজন হয়েছিল। এছাড়াও আছে উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক, স্নাতকোত্তর, মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং ও অন্যান্য পড়ুয়ারা। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী এরাজ্যের জনসংখ্যা ৯ কোটি ১৩ লক্ষের কাছাকাছি। সাক্ষরতার হার প্রায় ৭৬ শতাংশ। বর্তমান সময়ের নিরিখে সংখ্যাগুলো আরও বাড়বে। তাই সহজেই অনুমান করা যায়, মাঠ-ঘাট, খাল-বিল, নদী-নালা, বনজঙ্গল— সর্বত্র এই প্লাস্টিক দূষণ কীভাবে ছড়িয়ে পড়ছে।

অজয় ভট্টাচার্য

জাতীয় উদ্যান

মুদুমালাই

মুদুমালাই জাতীয় উদ্যান দক্ষিণ ভারতের তামিনাডু রাজ্যের নীলগিরি পর্বতমালায় কর্ণাটক ও কেরালা রাজ্যের সীমায় অবস্থিত। এই উদ্যান এবং সংরক্ষিত বন মিলিয়ে ৩৩০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। এই উদ্যানে ৫৫ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী, ২২৭ প্রজাতির পাখি, ৫০ প্রজাতির মাছ, ২১ প্রজাতির উভচর এবং ৩৪ প্রজাতির সরীসৃপ রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে হাতি, বাঘ, গৌড়, চিতাবাঘ-সহ বহু বিপন্ন প্রাণী। এটি তামিলনাড়ুর সবচেয়ে সুন্দর ও মনোরম উদ্যান। অরণ্যের প্রাণীরা অবাধে যত্রতত্র বিচরণ করে। এই উদ্যান পর্যটকদের কাছে স্বর্গস্বরূপ। এই উদ্যান সাধারণত জুন থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত বন্ধ থাকে।

এসো সংস্কৃত শিখি-৮৯

द्वितीया विभक्ति। सामान्य वाक्यानि (भाग-२)

अहं राकेशं पृच्छामि।

बालिका सखीम् अह्वयति।

स: उत्तरं वदति।

श्यामल: रोटिकां खादति।

भवान् फलरसं पिवति।

मौसुमी कवितां लिखति।

क: गीतं गायति?

उदाहरणानुसारं वाक्यानि रचयन्तु।

ভালো কথা

ফুলের মেলা

সৌম্যদের বাড়ির সবাই ফুলের ভক্ত। রাস্তা থেকে ওদের বাড়িতে যাবার রাস্তাটার দুপাশে ফুলে ফুলময়। কত রকমের যে গাঁদাফুল ফুটেছে গুনে শেষ করা যাবে না। সৌম্যর বাবা, মা, ঠাকুরদা-ঠাকুমা সবাই সকাল-সন্ধ্যায় ফুলগাছের যত্ন করেন। রাস্তা দিয়ে মানুষ যাবার সময় দাঁড়িয়ে দেখে। ফুলে হাত দেওয়া বারণ। ওরাও কেউ ফুল তোলে না। ওদের বাড়িতে লালু-ভুলু নামে দুটো কুকুর আছে। ফুল তোলার মতলবে কেউ দাঁড়ালে দুটোই একসঙ্গে ঘেউ ঘেউ করে ওঠে।

সৌম্যদের দেখে আমিও এবার দশটি গাঁদাফুলের গাছ লাগিয়েছি। একটু দেরি করে। খুব যত্ন করি। গাছে অনেক কুঁড়ি এসেছে। আর কদিন পরেই ফুল ফুটবে।

কমলিকা সেন, নবমশ্রেণী, নামোপাড়া, ঝালদা, পুরুলিয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) টি গি গি

(২) ষ্ঠ নী নি

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) না প্র বে ব দ স

(২) পা প্র ণ তি ষা মা

১০ নভেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) দেশপ্রেমিক (২) দেবমন্দির

১০ নভেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) মরণকামড় (২) লালিতপালিত

(১) শৌর্য্য দত্ত, অভিরামপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর। (২) কৃত্তিকা মণ্ডল, মকদুমপুর, ই বি, মালদা। (৩) মৌমিতা দেবনাথ, নিমতা, কল-৪৯। (৪) শুভম মাইতি, ক্যানিং, দ: ২৪ পরগনা।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.
74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556, Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

★ RETIREMENT PLANNING.
★ CHILDREN EDUCATION FUND.
★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
★ WEALTH CREATION.
★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206 9748978406
Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com
NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

সিউড়ী সংশোধনাগারে তারাশঙ্করের আবক্ষমূর্তি প্রসঙ্গে তারাশঙ্কর-স্মৃতি সাহিত্য সমাজের কিছু কথা

দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, বীরভূম জেলার সিউড়ী সংশোধনাগারে স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি আবক্ষমূর্তি স্থাপিত হয়। তারাশঙ্করের জেলমুক্তির পঁচানব্বই বছর, স্বাধীনতার প্রায় আট দশক এবং তারাশঙ্করের মৃত্যুর চুয়ান্ন বছরের মধ্যে সিউড়ী সংশোধনাগারে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবক্ষমূর্তি স্থাপন বীরভূম জেলার সংস্কৃতি চেতনার ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত বলেই মনে করতে হয়। সিউড়ীতে সাহিত্যচর্চার ইতিহাসে এবং রাজ্যে একের পর এক সরকার পরিবর্তনের ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত অবশ্যই স্মরণীয় এবং এর জন্য বীরভূম জেলা প্রশাসন এবং কারাদপ্তর সহ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতি—জেলাবাসীর পক্ষ থেকে 'তারাশঙ্কর-স্মৃতি সাহিত্যসমাজ' কৃতজ্ঞতা জানায়। এমন শ্রদ্ধান্বিত কৃতজ্ঞতার মাঝখানেও দৃষ্টিভঙ্গি-সহ গঠনমূলক চিন্তাভাবনার অভাবহেতু কিছু নেতিবাচকতা তারাশঙ্কর অনুরাগী হিসেবে আমাদের আঘাত দেয়। আমরা তার প্রতিবাদ করি। প্রতিবাদ এবং তার কারণ জানার আগে জানা দরকার সিউড়ি সংশোধনাগারে তারাশঙ্করের মূর্তি স্থাপনের আবশ্যকতা কোথায়! স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে সিউড়ী জেলে তারাশঙ্করের বন্দির সময় এবং তার আগে ও পরে স্বাধীনতা আন্দোলনের অপরাধে সিউড়ী জেলে তো অনেকেই বন্দি ছিলেন; তবু তাঁদের মধ্যে কেবলমাত্র তারাশঙ্করের মূর্তি স্থাপনের উদ্যোগ কেন?

স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার কারণে ১৯৩০ সালের ৭ আগস্ট থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত তারাশঙ্কর সিউড়ী জেলে বন্দি ছিলেন। বন্দিকালীন তিনি তাঁর 'পাষাণপুরী' উপন্যাসের সূচনা এবং পূর্বপ্রকাশিত 'চৈতালী ঘূর্ণি' উপন্যাসটির পরিবর্ধন করেছিলেন। মনে রাখতে হবে, কেবলমাত্র স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে তারাশঙ্করের কারাবন্দি বিষয়টি সময়োচিত একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনামাত্র ঠিক স্মরণীয় ইতিহাস নয়; ইতিহাস এটাই যে, তারাশঙ্কর তাঁর যে সাহিত্য- উপচারের নৈবেদ্যপাত্র পূর্ণ করে সারাজীবন বীরভূমের মাটি ও মানুষের কথা বলে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পেয়েছেন এবং নোবেলের দরজায় উপনীত হয়েছিলেন, তারাশঙ্করের সেই সাহিত্যপথে সংকল্পবদ্ধ হওয়ার গর্ভগৃহ বা আঁতুরঘর হলো সিউড়ীর জেলা কারাগার বা সংশোধনাগার। জেলখানায় বিদায় অভিনন্দন সভায় তারাশঙ্কর তাঁর সংকল্পের কথা ঘোষণা করে বলেছিলেন—'রাজনীতির পথ আমার নয়। আমার পথ সাহিত্যের পথ এবং সেই পথেই আমার গৃহীত সঙ্কল্পের সাধন করব। জীবন উন্মেষিত স্থানের নাম যেমন জন্মভূমি তেমনি সাহিত্যে উন্মেষিত জীবনচেতনাময় স্থানের নাম সাহিত্যভূমি।'

সেই সূত্রে সিউড়ী কারাগার তাঁর সাহিত্যভূমি। তারাশঙ্কর তাঁর 'পাষাণপুরী' উপন্যাসে সিউড়ী জেলখানার কাহিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন এবং তাঁর সমগ্র সাহিত্যজীবনের যে মূল ব্রত জন্মভূমিকে চিনে দেশকে চেনা; সেই সূচকচিত্র সিউড়ী কারাগারের

ফ ঃ ৬

কাহিনির স্মৃতিচিত্রে আজও আলোকিত হয়ে রয়েছে। 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসে—শিবনাথ নামের অন্তরালে তারাশঙ্কর কারাগারের সাক্ষাৎপ্রার্থীদের চৌকাঠে মাথা ঠেকিয়ে বলেছেন— সমস্ত জীবের ধাত্রী যিনি ধরিত্রী, জাতির মধ্যে তিনিই তো দেশ; মানুষের কাছে তিনি বস্তু। জন্মভূমিকে ভালোবাসা দেশকে ভালোবাসার পথে তারাশঙ্করের এই গভীর বাক্য দেশভাবনার এক মূলমন্ত্র। সিউড়ি কারাগার ঘিরে তারাশঙ্করের জীবনসাধনার এই স্মৃতিচিত্র বীরভূম তথা বঙ্গ ইতিহাসের এক অন্যতম উপাদান। সেই ইতিহাসকে স্মরণে রাখতে তাঁর গর্ভগৃহের প্রদীপশিখাটি জ্বালিয়ে রাখা এক উল্লেখযোগ্য বিষয়—যা তাঁর সমকালে বা আগে-পরে আর পাঁচজন স্বাধীনতা সংগ্রামীর সঙ্গে এক মাত্রায় পরিমাপ করা যায় না। এই প্রতিবেদক ব্যক্তিজীবনে তিন দশকের বেশি তারাশঙ্করচর্চার সূচনাপর্বে ১৯৯৮ সালে সিউড়ী জেল দেখতে গিয়েছি কিন্তু সেখানে তাঁর বন্দিজীবনের কোনো তথ্য বা রেকর্ডে পাওয়া যায়নি। তখনই মনে হয়েছিল এখানে তারাশঙ্কর বিষয়ক কিছু তথ্য কিছু স্মৃতি থাকলে ভালো হতো। পরে সিউড়ীতে ''তারাশঙ্কর-স্মৃতি সাহিত্যসমাজ'' নামে তারাশঙ্করের জন্য রেজিস্ট্রিকৃত একটি সংস্থা গড়ে তোলা হয়। যেখানে নিয়মিত সাহিত্যচর্চা সহ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রের আয়োজনও করা হয়। ২০২৩ সালের প্রথম দিকে তারাশঙ্কর বিষয়ক এক আন্তর্জাতিক আলোচনা সভার আহ্বায়ক এবং তারাশঙ্কর-স্মৃতি সাহিত্য সমাজের সম্পাদক হিসেবে এই প্রতিবেদক তার ব্যক্তিগত ভাষণে সেমিনার কমিটির পৃষ্ঠপোষক এবং বীরভূম জেলার পাবলিক প্রসিকিউটর শ্রীমলয় মুখোপাধ্যায়ের কাছে সিউড়ী কারাগারে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবক্ষমূর্তি স্থাপনের প্রস্তাব জানিয়েছিল। সেই সূত্রেই ২০২৩ সালে প্রস্তাবটি জেলা শাসক শ্রীবিধান রায় মহাশয়ের কাছে জানানো হয়। তারপর থেকে নিরন্তর প্রচেষ্টার সঙ্গে শ্রীমলয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের একচেটিয়া সহযোগিতার ফলেই আবক্ষমূর্তি স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। 'তারাশঙ্কর-স্মৃতি- সাহিত্যসমাজ' প্রস্তাব এবং নিরন্তর প্রচেষ্টাও স্মরণীয় মাত্র। বাকি কৃতিত্ব শ্রীমলয় মুখোপাধ্যায়-সহ বীরভূম জেলা প্রশাসন এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কারাবিভাগের প্রাপ্ত। পাঁক থেকে পদ্মফুল পর্যন্ত একটা বিবর্তনের রূপ যদি এখানে কল্পনা করা হয় তাহলে বলতে হয় বিকশিত পদ্মের সমগ্র কৃতিত্ব বীরভূম জেলা প্রশাসন এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের, পাঁক বা মাটি 'তারাশঙ্কর-স্মৃতি সাহিত্যসমাজ', বীজ সম্পাদকের ভাবনাপ্রসূত আর প্রস্তাবনা থেকে পদ্ম পর্যন্ত মৃণালের কৃতিত্ব শ্রীমলয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের। তাঁদের কৃতিত্বকে তারাশঙ্কর স্মৃতি সাহিত্য সমাজ সানন্দে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে।

বীরভূম-সংস্কৃতির ইতিহাসে তাঁদের এই উল্লেখযোগ্য অবদানের মাঝখানে গঠনমূলক পরিকল্পনার অভাব এবং তারাশঙ্কর সম্পর্কে তুলনামূলক কম জানার কারণে কিছু নিবিড় ভ্রান্তি নেতিবাচক দিককে উদ্ভাসিত করে তোলে। মূর্তি স্থাপন এবং মূর্তি নির্মাণ প্রসঙ্গে এই কথা বলতে হয়েছে। বন্দিশালার প্রধান দরজা তথা লৌহকপাটের বাইরে, জেলক্যাম্পাসে দুর্গামণ্ডপের পিছনে জেলখানার দিকে মুখ করে মূর্তিটি স্থাপিত হয়েছে। এখানেই সিউড়ীবাসীর চরম আপত্তি। প্রতিবাদ জানিয়ে বলা হয়, লোকচক্ষুর আড়ালে বিপরীত মুখে তারাশঙ্করের আবক্ষমূর্তি স্থাপন করা হলে বীরভূমের বোধ ও রুচিবোধের কলঙ্কিত পরিচয়ে তারাশঙ্করকে অপমান করা হবে এবং এমনটা হলে জেলা প্রশাসন এবং সরকারের ভাবমূর্তি কলুষিত হবে। 'তারাশঙ্কর-স্মৃতি সাহিত্যসমাজ' এমনটা চায়নি।

মূর্তিটা ওই জায়গাতে স্থাপিত হওয়ার কারণে সাধারণ মানুষের সহজে নজরে আসবে না এবং তাঁর জন্মদিন ও মৃত্যুদিন স্মরণে মূর্তির পাদপীঠে এক-এক করে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন ছাড়া পাঁচজন মানুষ গানে কথায় তাঁর স্মৃতিচারণা করার সুযোগ পাবেন না। যারা পেশাগতভাবে অপরাধী তাদের কাছে জেলখানা স্বাভাবিক এবং নিরাপদের জায়গা; কিন্তু সাধারণ এবং সম্ভ্রান্ত মানুষের কাছে বন্দিজীবনের অভিজ্ঞতা এক আতঙ্কিত অধ্যায়। মুক্তির পর আর সেদিকে ফিরে তাকাবার মানসিকতা তাঁদের মধ্যে আসবে না। সেই অর্থে জেলের দিকে মুখ করে আবক্ষমূর্তি স্থাপন প্রচলিত প্রথা বিরুদ্ধ; এটা কোনোভাবেই কোনো সম্মান প্রদর্শন করে না, কোনো সদর্থকতাও বোঝায় না। তারাশঙ্কর সম্ভ্রান্ত পরিবারের একজন ব্যক্তিত্বপরায়ণ মানুষ ছিলেন। তাঁর মূর্তি উপস্থাপনার বিপরীতমুখিনতা দিকটি অনেকখানি নিবিড় নেতিবাচক হয়ে ওঠে। কারাগার সংশোধনাগার বিপরীতমুখিনতা দিকটি অনেকখানি নিবিড় নেতিবাচক হয়ে ওঠে।

কারাগার সংশোধনাগার নামে অভিহিত হলেও তা যে কোনো না কোনো পাপের প্রায়শ্চিত্তের জায়গা সে কথা কারও অজানা নয়। জেলের দিকে মুখ করে থাকা মানে হলো কারাগারের দিকে চালিত হওয়া, যা সাধারণত কোনো ব্যক্তিকে কারাবন্দি করার বা তার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করার ইঙ্গিত দেয় এবং একটি ভুল বা অন্যায়ের স্মৃতি প্রকাশের প্রতীকী বার্তা দেয়। তারাশঙ্কর তাঁর জেলজীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা 'পাষাণপুরী' উপন্যাসে—জেলখানাকে গুমখানা বলেছেন। জেলখানার প্রাচীরের যে লাল রং তা তারাশঙ্করের মতে যুগ যুগান্তর ধরে কত বন্দির আত্মা মাথা কুটে তাঁর সমস্ত অঙ্গ রক্তাক্ত করে তুলেছে। জেলখানা সম্পর্কে যে তারাশঙ্করের এমন ভয়ঙ্কর ও নেতিবাচক অভিজ্ঞতা সেই তারাশঙ্করের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে

গিয়ে বিপরীত মুখের দিকটি কোন সঙ্কেত বহন করে তা নতুন করে ব্যাখ্যা করার দরকার হয় না। আরও বলতে যে, স্বাধীনতা সংগ্রামী কথাসাহিত্যিকের স্মৃতি স্মরণে আবক্ষমূর্তি স্থাপনকরার উদ্যোগে তারাশঙ্কর জীবনের সময়োচিত মূলসুরটিকে স্মরণে রাখা দরকার। বন্দিসময়ে তারাশঙ্কর গান্ধীজীর আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন যে আদর্শের পটভূমি ছিল ধর্মজীবন। গান্ধীজীর আদর্শে বিশ্বাসী হলেও তারাশঙ্কর মূলত অনুশীলন সমিতির সদস্য ছিলেন এবং সেই আদর্শেই তিনি তাঁর জীবনসাধনা ও সাহিত্যসাধনায় নিজেকে গড়ে তোলেন। অনুশীলন সমিতির ভক্তিপথে দেশভক্তি একটি একটি আত্মনিবেদন; জাতীয় আন্দোলনে সনাতনী পথ এবং ভারতীয় হিন্দু জাতীয়তাবোধের আদর্শ। সশস্ত্র বিপ্লবীদের সংস্পর্শে এসে এবং গীতাপাঠে তারাশঙ্কর তাঁর জীবনাধারটি স্বাধীনতাযুদ্ধের সাধনাক্ষেত্র করে তুলেছিলেন এবং তারাশঙ্করের সাহিত্য তাঁর জীবনসাধনার বিকশিত পুষ্প-সিদ্ধির সৌরভ; হিন্দু জাতীয়তাবোধের পথে ভারত-ভাবনার ধ্যানময় রূপচিত্র। সেই তারাশঙ্করের আবক্ষমূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন কোন মুখে করা সঙ্গত সেটা নিবিড় ভাবনার বিষয়। এখানে জেলা প্রশাসন বা রাজ্য সরকারের প্রতি সংস্কার বিরোধী একটি নেতিবাচক মাত্রা যোগ হওয়ার সম্ভবনাও থাকে। সংস্থার প্রস্তাবকে মান্যতা দিয়ে যে প্রশাসন বা সরকার একটি ভালো কাজ করলেন তিনি কোনো সংস্কার বিরোধী মাত্রায় অভিহিত হন এটা কেউ চায়নি। এমন পঞ্চবিধ নিবিড় ভাবনা জেলা প্রশাসনের মাথায় আসেনি বলেই এমনটা সম্ভব হয়েছে একথা বলতে হয় এবং বলা হয়েছে। একজন জেলা শাসক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে জেলাসংস্কৃতির ধারক ও বাহক। বীরভূমের বর্তমান জেলা শাসক মাননীয় বিধান রায় মহাশয় গত তিন বছরের কিছু বেশি সময় ধরে ব্যক্তিগতভাবে এই প্রতিবেদকের পরিচিত। তিনি আমাদের সংস্থার পৃষ্ঠপোষকও। সরকারের চেয়ারে বসেও তিনি সব মানুষের সঙ্গে সহজভাবে মেশেন, সমস্যার সমাধান করার চেষ্টাও করেন। আমাদের মনে হয়েছে বিধান রায়ের মতো জেলাশাসককে পেয়ে বীরভূমের মানুষ ধন্য। আমরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়েও অভিযোগ করতে বাধ্য হয়েছি। যে জায়গাটিতে মূর্তিটি স্থাপিত হয়েছে সেখানে বিপরীত মুখী ছাড়া আর উপায় ছিল না।

এই উপায়হীনতার মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বর্তমান কারাধ্যক্ষ মহাশয়ের প্রথমাবধি তারাশঙ্কর বিরোধী মনোভাবের ইচ্ছাটি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

মূর্তি স্থাপন বিষয়ে জেলা শাসক এবং পরে কারাদপ্তরের নির্দেশে সিউড়ীর কারাধ্যক্ষ মহাশয় আমাদের নিয়ে একাধিকবার মিটিং করেছেন। প্রথম মিটিংয়ে সভাপতিত্ব করেন বিভাগীয় এ.ডি.জি মাননীয় শ্রীসুব্রত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। এ বিষয়ে তাঁর দূরদৃষ্টি ও উদ্যোগী মনোভাবের কথা আমাদের কাছে স্মরণীয়। কারাধ্যক্ষের আহ্বানে প্রথম মিটিংয়ের দিন আমরা দুটি বিষয়ে প্রস্তাব দিয়েছিলাম।

তারাশঙ্কর যে সেলটিতে বন্দি ছিলেন সেই সেলটিকে হেরিটেজ সেল হিসেবে সংরক্ষিত রাখা এবং সংশোধনাগারের মধ্যে পতাকাবেদীর পাশে আবক্ষমূর্তি স্থাপন—যেখানে একটি মঞ্চও আছে। কারাধ্যক্ষ মহাশয় সেল সংরক্ষণে রাজি ছিলেন না এবং মূর্তিস্থাপন বিষয়ে বাইরের এই জায়গাটির কথাই বলেছিলেন। এডিজি সাহেব মূর্তিটি জেল ক্যাম্পাসে দুর্গামণ্ডপের পাশে স্থাপনের পরামর্শ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন বিশেষ বিশেষ দিনে তারাশঙ্কর চর্চার জন্য দুর্গামণ্ডপের বারান্দাটি ব্যবহার করা যাবে এবং দরকার মতো সংশোধনাগারের পক্ষ থেকে পাখা লাগিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থাও করা হবে। সেদিন সেলটিকে হেরিটেজ হিসেবে এবং মূর্তিটিকে সেই সেলের কাছাকাছি পাওয়ার জন্য সংশোধনাগারের ভিতর পতাকাবেদীর কাছে স্থাপনের প্রস্তাব নিয়ে একটি রেজোলুশন করা হয়। পরে জানা যায় সেলটি পাওয়া যাবে না তখন মূর্তিটি যাতে জেল ক্যাম্পাসে দুর্গামণ্ডপের পাশে স্থাপিত হয় এমন আবেদন নিয়ে জেলা শাসক মহাশয়ের সঙ্গে আমাদের কথা হয়। জেলাশাসক আমাদের প্রস্তাবে রাজি হয়েছিলেন কিন্তু পরিবর্তিত জায়গাটি নির্ধারণ করার সময় আমাদের সঙ্গে কোনো আলোচনা করেননি। আলোচনা করলে বোধ হয় এমনটা হতো না।

তারাশঙ্করের প্রতিকৃতি বা মূর্তি নির্মাণেও আমাদের অভিযোগ রয়েছে। তারাশঙ্করের প্রচলিত বা অপ্রচলিত কোনো ছবির সঙ্গেই আবক্ষমূর্তির মিল নেই। মূর্তিটি নান্দনিক পুতুল হিসেবে সুন্দর হয়েছে কিন্তু ঠোঁটের গঠন, চোখের দৃষ্টিভঙ্গী, কপালের প্রশস্ততা, মাথার টাক এমনকী পাঞ্জাবির বোতাম—এমন অনেক দিক থেকেই অমিলের কারণে—মার্বেল ফলকের নাম দেখে মূর্তিটিকে তারাশঙ্করের বলে মেনে নিতে হয় কিন্তু চোখে ধরে না। মূর্তি নির্মাণের শিল্পী নির্ধারণে জেলাশাসক মহাশয় কোনোভাবেই যুক্ত ছিলেন না বলেই জানা যায়। এখানে উদ্যোগকারীর একক উদ্যোগের নির্ভরশীলতায় বীরভূমের সংস্কৃতি চেতনাকে সঙ্কীর্ণ করা হয়েছে। মূর্তি-উন্মোচন অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিকতায় 'তারাশঙ্কর-স্মৃতি সাহিত্যসমাজ' দুর্বলতা ভুলে থাকার নয়। এমনকী শিষ্টাচার প্রদর্শনে তারাশঙ্করের পরিবারকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।

এরই মধ্যে আনন্দের খবর যে, আমাদের প্রস্তাবে যে সেলটিকে হেরিটেজ সেল হিসেবে সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছিল তা হয়নি; কিন্তু সেটা নতুন করে ভাবনার কথা আমাদের কানে এসেছে। □

রাষ্ট্রীয় ভাবনাই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ভাবনা

গীতাঞ্জলি

ভারত কোনো সাধারণ দেশ নয়; এটি দেবতা ও মুনি-ঋষিদের তপোভূমি, ঋষিদের সাধনার ভূমি এবং অগণিত সন্ত- মহাপুরুষদের কর্মভূমি। এখানকার নদ-নদী কেবল জলের ধারা নয়, বরং 'মা গঙ্গা, মা যমুনা' বলে পূজিত। এখানকার পর্বত কেবল শিলাখণ্ড নয় বরং 'গিরিরাজ হিমালয়' বলে বন্দিত। এখানকার ভূমি কেবল মাটি নয়, বরং 'মাতৃভূমি' রূপে সমাদৃত। এই আধ্যাত্মিক দৃষ্টিই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ভাবনার মূল ভিত্তি। এই ভূমি, নদী, পর্বত, ঋষি-মুনিদের তপোবন এবং সহস্রাব্দ ধরে সঞ্চিত সংস্কৃতি ভারতকে এক অনন্য জাতীয় সত্তা প্রদান করেছে। এখানকার জীবনদর্শন, ধর্ম, সংস্কৃতি, ভাষা ও ঐতিহ্য হাজার বছর ধরে বিশ্ব মানবতাকে পথনির্দেশ করে এসেছে।

স্বাধীনতার আগে ও পরে ভারতের সামনে সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন ছিল— 'রাষ্ট্রের আত্মা কী? তার মূল ভাবনা কী?' এই প্রশ্নই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ভাবনার ভিত্তি হয়ে ওঠে। প্রাতঃস্মরণীয় ডাক্তার কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার বহু বিদ্বান ও গুণীজনের সঙ্গে আলোচনা ও চিন্তন-মন্থনের পর অনুভব করেন যে, ভারতের আত্মা হলো তার সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতিভিত্তিক সংগঠন ও রাষ্ট্র-ভাবই ভারতের শক্তির ভিত্তি। আর সেই কারণে এই সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রভাব পুনর্জাগরণের উদ্দেশ্যে তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই সঙ্ঘ এই সত্যকে ঘোষণা করেছে এবং শতবর্ষের যাত্রায় তা প্রমাণও করেছে। সঙ্ঘের চিন্তা কোনো সংকীর্ণ বা দলীয় চিন্তা নয়, বরং ভারতীয় সংস্কৃতির শাশ্বত রাষ্ট্রীয় তত্ত্বের প্রতিপাদন। সঙ্ঘ-চিন্তা কোনো ব্যক্তি, দল বা ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে নয়; বরং ভারতীয় শাশ্বত তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, যা ভারতীয় সংস্কৃতির জীবন্ত রূপ। তাই সংক্ষেপে বলা যায়, রাষ্ট্রীয় ভাবনাই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ভাবনা।

ভারতীয় সংস্কৃতি এবং সঙ্ঘ-চিন্তনে রাষ্ট্রের রূপ : ভারতীয় সংস্কৃতি অনুসারে রাষ্ট্র হলো তার ইতিহাস, ঐতিহ্য, ভাষা, আচরণ, মূল্যবোধ ও জীবনদৃষ্টির জীবন্ত প্রকাশ। ভারতীয় সংস্কৃতিতে রাষ্ট্রের অর্থ কেবল সত্তা বা শাসনব্যবস্থা নয়; বরং এটি এক জীবন্ত আধ্যাত্মিক সত্তা, যার আত্মা হলো তার সংস্কৃতি। বেদ প্রভৃতি ভারতীয় প্রাচীন শাস্ত্রসমূহেও রাষ্ট্রের ধারণাকে কেবল ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ করা হয়নি। অথর্ববেদে ঘোষিত হয়েছে— 'জনং বিভ্রতি বহুধা বিবাচসম্, নানাধর্মাণং পৃথ্বী যথৌকসম্' ১২.১.৪৫ অথর্ববেদ। অর্থাৎ আমাদের এই মাতৃভূমি নানা ভাষাভাষী, ধর্মমত, পন্থ প্রভৃতি বিভিন্ন রূপের মানুষকে ধারণ করে আছে। রাষ্ট্রের তিনটি উপাদান বলা হয়েছে— ভূমি (Territory), জন (Population) এবং সংস্কৃতি (Culture)। যখন এই তিনটি একসূত্রে আবদ্ধ হয়, তখনই রাষ্ট্রের পরিভাষা যথার্থ রূপে বাঙ্ময় হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন— 'Every nation has a message to deliver, a mission to fulfill, a destiny to reach.' ভারতের প্রকৃতি হলো অধ্যাত্ম। তার উদ্দেশ্য হলো মানবতাকে জীবন ও বিজ্ঞানের শিক্ষা দেওয়া, আর তার লক্ষ্য হলো বিশ্বগুরু রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ। সঙ্ঘ এই রাষ্ট্রধর্মকেই পুনর্জাগরিত করার কাজ করে চলেছে। সঙ্ঘ মনে করে— হিন্দুত্ব কোনো উপাসনাপদ্ধতি নয়, বরং জীবনপদ্ধতি। যাঁরা ভারতকে মাতৃভূমি ও পবিত্রভূমি হিসেবে মেনে নেয়, তাঁরাই

এই সংস্কৃতির অঙ্গ— ভারতীয়তা= হিন্দুত্ব= রাষ্ট্রচেতনা।

ভারতের ঐক্য তার বৈচিত্র্যের মধ্যেই নিহিত। এই দৃষ্টিই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ভাবনার কেন্দ্র— 'আমরা সবাই ভারতীয়, আমাদের জীবন, আমাদের সংস্কৃতি এবং আমাদের রাষ্ট্র এক।' ভারতীয় ঐতিহ্যে মাতৃভূমিকে সাক্ষাৎ মাতারূপে দেখা হয়েছে। অথর্ববেদে বলা হয়েছে, **মাতা ভূমিঃ পুত্রোঽহং পৃথিব্যাঃ**— অর্থাৎ এই ভূমি আমার মা, আমি তার পুত্র। তাই ভারতভূমি কেবল মাটির খণ্ডমাত্র নয়, বরং জীবন্ত সত্তা। 'ভারতমাতা'-র স্বরূপ কেবল ভাবাত্মক নয়, বরং আধ্যাত্মিকও। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা প্রার্থনায় **নমস্তে সদা বৎসলে মাতৃভূমে** উচ্চারণ করে দেশকে 'মা' মনে করে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। এটি কোনো নতুন ধারণা নয়— এ সেই একই অনুভূতি, যা রামায়ণের শ্রীরাম থেকে মহাভারতের ভীষ্ম পর্যন্ত প্রকাশ করেছেন, **জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।**

সঙ্ঘ-চিন্তা ভারতীয় সাংস্কৃতিক চেতনার পুনর্জাগরণ। এটি আমাদের স্মরণ করায় যে আমাদের মাতৃভূমি কেবল মাটি নয়, বরং জীবন্ত সত্তা। যতদিন জাতির আত্মা নিরাপদ থাকবে, ততদিন ভারত অখণ্ড ও অজেয় থাকবে— এই ভাবে সঙ্ঘের রাষ্ট্রবিচার ভারতীয় সংস্কৃতির গভীরতা থেকে উদ্ভূত। ভারতীয় দৃষ্টিতে জাতি হলো একাত্মতার প্রতীক। আর এই একাত্মতার ভাবই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ভাবনার মূল ভিত্তিস্বরূপ। **সঙ্ঘে শক্তিঃ কলৌ যুগে**— ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির পাতায় জাতির পরাধীনতা এবং সমাজের আত্মবিস্মৃতির বহু কাহিনি লিপিবদ্ধ আছে। ডাঃ হেডগেওয়ার এই বাস্তবতার সূক্ষ্ম অধ্যয়ন করে দেখেছিলেন যে ভারতের অধঃপতনের মূল কারণ কেবল বাইরের আক্রমণ বা শাসন নয়, বরং অভ্যন্তরীণ বিকার ও সমাজের আত্মবিস্মৃতিও সমানভাবে দায়ী। তাঁর মতে তিনটি প্রধান দোষ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল— **আত্মবিস্মৃত সমাজ, আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তি এবং সামূহিক অনুশাসনের অভাব।**

আত্মবিস্মৃতি সমাজে নিজের গৌরবময় অতীত, নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের বোধ এবং রাষ্ট্রীয় একাত্মতার অনুভূতি হারিয়ে যায়। যখন সমাজ নিজের মূল, মূল্যবোধ, মহান ব্যক্তিত্ব ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন সে আত্মগৌরবহীনতা, নিরাপত্তাহীনতা এবং হীনম্মন্যতায় ভোগে। এই হীনম্মন্যতা ভাষা, শিক্ষা, ইতিহাস এমনকী জীবনমূল্যেও প্রতিফলিত হয়। ব্যক্তি যখন কেবল নিজের স্বার্থে নিমগ্ন থাকে এবং সমাজের হিতকে উপেক্ষা করে, তখন রাষ্ট্রের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। আর যখন সমাজে অনুশাসনের অভাব দেখা যায়, তখন সকল আন্দোলন ও প্রচেষ্টা বিফল হয়ে যায়, পরিণামে দেশ খণ্ডিত হয়। ব্রিটিশ শাসন ও মুসলমান আক্রমণের ফলে প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ভারতীয় জনমানসে ক্ষোভ জন্ম নিয়েছিল বটে, কিন্তু তা ছিল আবেগনির্ভর ও সংকীর্ণ। আধুনিক দৃষ্টিতে তাকে 'ইতিবাচক রাষ্ট্রভক্তি'-র পরিপূর্ণ ধারণা ছাড়াই দেখা হয়েছে। যার ফলে, স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বে পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের অভাব থেকে যায় এবং কিছু আন্দোলন তো নিজের লক্ষ্য থেকেও বিচ্যুত হয়ে যায়।

এই সকল পরিস্থিতির বিচার-বিশ্লেষণ করে ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার স্পষ্টরূপে ঘোষণা করেছিলেন— 'ভারত হিন্দু রাষ্ট্র'। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, শক্তির মাধ্যমেই সমস্ত কাজ সম্ভব, আর সেই শক্তি সংগঠনের মধ্যেই নিহিত। তাই সংগঠন ও অনুশাসনই রাষ্ট্র নির্মাণ ও সামজ-সংস্কারের ভিত্তি। ডাঃ হেডগেওয়ারের মতে, কেবল জাগরণ ও শক্তিশালী সংগঠনের মধ্যেই সমাধান নিহিত আছে। আর এমন সংগঠন তখনই গড়ে উঠতে পারে, যখন তাতে থাকবে আত্মগৌরবসম্পন্ন, সুসংস্কারিত, অনুশাসনবদ্ধ, চরিত্রবান, শক্তিসম্পন্ন এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ মানুষ।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসবেক সঙ্ঘের ত্রিমাত্রিক স্বরূপ :

১. রাষ্ট্রীয় : যে ব্যক্তি নিজের দেশ, তার সংস্কৃতি, মহাপুরুষ ও ঐতিহ্যের প্রতি নিষ্ঠাবান; তার হৃদয় রাষ্ট্রের সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয় এবং মিত্র-শত্রুর সমান অনুভবের সঙ্গে একাত্ম হয়। রাষ্ট্রীয়তার এই প্রকৃত স্বরূপ হিন্দু সমাজে নিহিত। তাই হিন্দুত্ব ও রাষ্ট্রীয়ত্ব অভিন্ন, সমার্থক।

২. স্বয়ংসেবক : যে নিঃস্বার্থভাবে, অনুশাসনপূর্বক ও পরিকল্পিতরূপে মাতৃভূমির সেবা করে। স্বয়ংসেবক নিজে থেকেই অনুপ্রাণিত হয়, তার কর্তব্যবোধ স্থায়ী ও পূর্ণাঙ্গ।

৩. সঙ্ঘ : সমান বিচার ও সম লক্ষ্যযুক্ত মানুষের সংগঠন। সঙ্ঘ শুধু সংগঠন নয়, বরং এটি শক্তির উৎস— ঐক্যবদ্ধ, বিশ্বস্ত ও নিষ্ঠাবান শক্তি।

সঙ্ঘকাজের আধ্যাত্মিক ভিত্তি হলো ঈশ্বরীয় কাজ— সঙ্ঘের প্রার্থনায় বলা হয়েছে— ত্বদীয়ায় কার্যায় অর্থাৎ হে প্রভু! এই কাজ আপনারই। সঙ্ঘের প্রতিটি প্রচেষ্টা সত্য ধর্ম ও ন্যায়ের সংরক্ষণের জন্য। ঈশ্বরীয় কাজের সার হলো— সজ্জন শক্তির রক্ষা, দুষ্টের বিনাশ এবং ধর্মের প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ— এই তিনটি দিক সঙ্ঘের কাজে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত। সঙ্ঘ শুধু সমাজে অনুশাসন ও নৈতিকতাই প্রতিষ্ঠা করে না, বরং সদগুণের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে দেবত্বের জাগরণ ঘটায়। সঙ্ঘের সংস্কার থেকে সক্রিয়, নিঃস্বার্থ, ন্যায়নিষ্ঠ ও সংবেদনশীল মানুষ গড়ে ওঠে, যারা সমাজের আত্মবিশ্বাস ও সহিষ্ণুতাকে বৃদ্ধি করে। ধর্মের ভিত্তিতে সমাজের ধারণশক্তি ও নৈতিকতার বিকাশ সাধিত হয়। সঙ্ঘের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট করে যে, প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্র-নির্মাণ কেবল ধর্ম, সত্য ও সংগঠনের মাধ্যমেই সম্ভব। রাষ্ট্র কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধে পরিপূর্ণ জীবনের উপলব্ধি। এটি কেবল সংগঠনের পরিকাঠামো নয়, বরং জাতির আত্মা। এটি সমাজের সদগুণ, জাতির গৌরব, অনুশাসন ও ঈশ্বরীয় কাজের প্রতীক।

সঙ্ঘ-বিচারের তিন কেন্দ্রীয় স্তম্ভ—

সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রবোধ : ভারতের পরিচয় তার প্রাচীন সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, জীবনদর্শন, ঐতিহ্য ও আধ্যাত্মিকতায় নিহিত। সঙ্ঘের বৈচারিক আদর্শ এই শাশ্বত সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত যে, ভারত একটি সাংস্কৃতিক রাষ্ট্র, যার আত্মা হলো সনাতন সংস্কৃতি। ভাষা, প্রদেশ, জাতি বা ঐতিহ্য ভিন্ন ভিন্ন হলেও, এই সংস্কৃতিই ভারতকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে। ঋগ্বেদের মন্ত্র— একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি অর্থাৎ সত্য এক, কিন্তু জ্ঞানীরা তাকে নানা রূপে ব্যক্ত করেন। এটাই ভারতের সহিষ্ণুতা ও বৈচিত্র্যের মধ্যেকার ঐক্যের ভিত্তি। সঙ্ঘের জীবনদর্শন বেদ ও উপনিষদের এই ভাবনাকেই প্রতিধ্বনিত করে।

একাত্মতা : উপনিষদ ঘোষণা করেছে— **ঈশাবাস্যমিদং সর্বং**

যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। সমগ্র জগতে এক পরমাত্মাই বিরাজমান। এই সত্যের ভিত্তিতে সঙ্ঘের দৃষ্টিভঙ্গি হলো— সমগ্র সৃষ্টিতেই একাত্মতা বিদ্যমান। তাই **বসুধৈব কুটুম্বকম্** কেবল একটি স্লোগান নয়, বরং জীবনযাপনের একটি পদ্ধতি।

সামূহিকতা : অথর্ববেদের মন্ত্র— **সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্,** অর্থাৎ আমরা যেন একসঙ্গে চলতে পারি, একসঙ্গে বলতে পারি এবং আমাদের চিন্তাভাবনা এক হোক। সঙ্ঘ এই সামূহিকতাকে সমাজ জীবনে মূর্তরূপ প্রতিষ্ঠিত করে চলেছে।

সঙ্ঘের জীবনদর্শন— সঙ্ঘভাবনা ভারতীয় জীবনদর্শনের প্রতিবিম্ব, যা রাষ্ট্রবোধ, সংগঠন ও অনুশাসন, ত্যাগ ও সেবা, জীবনমূল্য ও আচরণ, সৌহার্দ্য ও সমতা, একাত্মতা, স্বদেশি ও আত্মনির্ভরতার মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত— এটাই আজকের ভারতের প্রয়োজন।

রাষ্ট্র সর্বোপরি : সঙ্ঘের মূলমন্ত্র হলো— **রাষ্ট্র সর্বপ্রথম।** ব্যক্তি, সমাজ, জাতি, ধর্ম, রাজনীতি— কিছুই রাষ্ট্রের উপরে নয়। সবকিছুই রাষ্ট্রের অধীন। যখন রাষ্ট্র নিরাপদ ও শক্তিশালী হবে, তখনই ব্যক্তি ও সমাজ নিরাপদ ও উন্নত হবে। তাই সঙ্ঘের সমস্ত কাজই রাষ্ট্র-নির্মাণ, চরিত্র-নির্মাণ ও সমাজ সংগঠনের দিকে অগ্রসর। ড. হেডগেওয়ার ঘোষণা করেছিলেন— **আমাদের সংগঠন কোনো ব্যক্তি, জাতি বা সম্প্রদায়ের নয়; এটি সমগ্র রাষ্ট্রের সংগঠন।**

সংগঠন ও অনুশাসন : সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেছেন ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার ১৯২৫ সালে। তাঁর মতে, ভারতের দুর্দশার মূল কারণ হলো সমাজের সংগঠনহীনতা এবং জাতি-ভাবের হ্রাস। যদি সমাজ পুনরায় সংগঠিত হয় এবং নিজেদের সংস্কৃতির উপর গর্ব করতে শেখে, তবে ভারত আবারও জগদ্গুরু হতে পারবে। এই সংগঠন কেবল বাহ্যিক নয়, অভ্যন্তরীণও— মন, চিন্তা ও আচরণের ঐক্য। এটাই সঙ্ঘের রাষ্ট্রীয় ভাবনা। অনুশাসন ও সংগঠনে সমৃদ্ধ রাষ্ট্রপ্রেমী সমাজই রাষ্ট্রের সুরক্ষা, সমৃদ্ধি ও সদগুণের স্থায়ী বিকাশ ঘটাতে সক্ষম।

ত্যাগ ও সেবা : সঙ্ঘ-চিন্তা সেবার মাধ্যমে রূপ নেয়। এটি কেবল বৈচারিক নয়, বাস্তব আচরণেও প্রতিফলিত। সমাজ যখন বিপদের সম্মুখীন হয়েছে— ভূমিকম্প, বন্যা, মহামারী বা যুদ্ধ— সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা সর্বপ্রথম সেবাকাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। সঙ্ঘের বিশ্বাস— সমাজের দুর্বল, পীড়িত ও উপেক্ষিত শ্রেণীর সেবা করাই প্রকৃত রাষ্ট্রধর্ম। সেবাভাব ভারতীয় সংস্কৃতির জীবন্ত প্রকাশ। এই সেবার মধ্যে কোনো স্বার্থ নেই; এটি কেবল সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য এবং তা নিঃস্বার্থ রাষ্ট্রভাব থেকেই উদ্ভূত। এটাই সঙ্ঘের রাষ্ট্রনিষ্ঠা।

জীবনমূল্য ও আচরণ : সঙ্ঘ-বিচার ত্যাগ, সেবা, শৃঙ্খলা, সৌহার্দ্য ও সামুহিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত। সঙ্ঘ শাখার মাধ্যমে ব্যক্তিকে অনুশাসনবদ্ধ, নিঃস্বার্থ ও রাষ্ট্রপ্রেমী রূপে গড়ে তোলার কাজ করে চলেছে। এটি কেবল সংগঠনের বাইরের কাঠামো নয়, বরং মন, চিন্তা ও আচরণের ঐক্য। ভগবদগীতা বলেছে— **স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, পরধর্মো ভয়াবহঃ,** অর্থাৎ নিজের কর্তব্যে মৃত্যু হলেও তা কল্যাণকর কিন্তু অন্যের কর্তব্য পালন ভয়ংকর। সঙ্ঘ এই কর্তব্যবোধের উপর ভিত্তি করে জীবন গঠনের পথনির্দেশক।

সৌহার্দ্য ও সাম্য : যেমন একটি বাদ্যবৃন্দে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন সুর তুলেও একসঙ্গে মিলিয়ে মধুর সংগীত সৃষ্টি করে, তেমনি ভারতের বৈচিত্র্য ঐক্যে রূপান্তরিত হয়ে মধুর সাম্য রচনা করে। তাই জাতি, ভাষা, প্রদেশ, পন্থ, সম্প্রদায় বা শ্রেণীভেদের ঊর্ধ্বে উঠে সমাজকে ঐক্যসূত্রে বাঁধাই সঙ্ঘের লক্ষ্য। সঙ্ঘের শাখাগুলি সমাজকে সকল বিভেদের ঊর্ধ্বে তুলে একসূত্রে আবদ্ধ করে।

স্বদেশি ও আত্মনির্ভরতা : সঙ্ঘ মনে করে ভারত তখনই প্রকৃত উন্নতি করবে, যখন তার বিকাশ সংস্কৃতি ও সম্পদের উপর ভিত্তি করে হবে।

সঙ্ঘের ভাবনা কোনো সম্প্রদায়, শ্রেণী বা অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং সমগ্র ভারতবর্ষকে **এক রাষ্ট্র** হিসেবে মনে করে, যা সকল ভারতীয়কে একাত্মতার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য প্রেরণা দেয়। সঙ্ঘের কার্যপদ্ধতি— শাখা, অনুশাসন, সেবা ও সংগঠন রাষ্ট্র নির্মাণের দৃঢ় ভিত্তি।

স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গি এবং সঙ্ঘ— স্বামী বিবেকানন্দ স্পষ্টভাবে বলেছেন— **ভারতের ভবিষ্যৎ রাজনীতি বা অর্থনীতির ওপর নির্ভর করবে না; ভারতের ভবিষ্যৎ গড়বে তার সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতা** তিনি ভারতীয় সমাজকে আত্মমর্যাদা ও আত্মগৌরবের সঙ্গে পরিপূর্ণ করার গুরুত্ব বুঝিয়েছিলেন। তাঁর স্পষ্ট কথা যে, ভারতের উন্নয়ন তখনই সম্ভব যখন এই দেশ তার মূল শিকড় এবং চিরন্তন আদর্শের ওপর ভিত্তি করে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াবে। স্বামীজী একদিকে যুবসমাজকে সংগঠন ও শক্তির বার্তা দিয়েছিলেন— **আমার কাছে একশো উগ্র দেশভক্ত যুবকের দল থাকলে আমি ভারতকে পরিবর্তন করতে পারব।** অন্যদিকে তিনি ভারতীয়তার মহিমা ঘোষণা করেছিলেন— **আমি গর্বিত যে আমি সেই দেশের সন্তান, যা বিশ্বের প্রতি সহিষ্ণুতা এবং সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতার অমূল্য বার্তা দিয়েছে।** সঙ্ঘ এই মন্ত্রকে ব্যবহারিক রূপে বাস্তবায়িত করেছে। শাখার মাধ্যমে চরিত্র, সংগঠন, অনুশাসন এবং সেবার শিক্ষা দেওয়া, স্বামী বিবেকানন্দের এই দৃষ্টিভঙ্গির বাস্তব রূপ। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ভাবনাই প্রকৃতপক্ষে স্বামী বিবেকানন্দের এই বার্তাগুলোর ব্যবহারিক রূপ। শাখার মাধ্যমে যুবশক্তির সংগঠন, মাতৃভূমির আরাধনা এবং সেবা-চেতনা— এসবই স্বামীজীর স্বপ্নের ভারতের পথ প্রশস্ত করে চলেছে।

সঙ্ঘের শতবর্ষীয় যাত্রায় রাষ্ট্রীয় ভাবনার উদাহরণ—

স্বাধীনতা আন্দোলন (১৯৩০-৪৭) : ডাঃ হেডগেওয়ার নিজেও স্বাধীনতা আন্দোলনে কারাবন্দি হন। সঙ্ঘের অনেক স্বয়ংসেবক ১৯৪২-এর ‘ভারত ছাড়ো আন্দোলনে’ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যদিও সঙ্ঘ সরাসরি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেনি, তবুও যুবশক্তির সংগঠন এবং রাষ্ট্রীয়চেতনার সঞ্চার করেছে, যা স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রেরণার ভূমি তৈরি করেছিল।

বিভাজনের সময় (১৯৪৭) : দেশ বিভাজন এবং পাকিস্তান গঠনের সময় সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারা শরণার্থীর সেবায় নিয়োজিত হন। দিল্লি, পঞ্জাব, বঙ্গ— প্রত্যেক স্থানে ত্রাণ শিবির পরিচালনা করা হয়। এই সেবা ছিল রাষ্ট্রীয়চিন্তার সরাসরি প্রমাণ যে, শুধুমাত্র ভূমি নয়, মানুষ ও সংস্কৃতিও।

১৯৬২-এর ভারত-চীন যুদ্ধ : লাদাখ এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্তে সৈন্যদের সহায়তার জন্য সঙ্ঘের হাজার হাজার স্বয়ংসেবক এগিয়ে

এসেছিলেন। তখনকার জওহরলাল নেহরু পরিচালিত সরকার সঙ্ঘকে সীমান্ত সুরক্ষায় সহায়তা করার অনুরোধ করেছিল। এর জন্য ১৯৬৩ সালে দিল্লি সাধারণতন্ত্র দিবসের প্যারেডে সরকারের আমন্ত্রণে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই ঘটনা প্রমাণ করে, রাষ্ট্রীয় সংকটে সঙ্ঘকে **রাষ্ট্রীয় শক্তি** হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল।

১৯৭৫-৭৭-এর জরুরি অবস্থা : যখন দেশে গণতন্ত্রকে নির্মম ভাবে দমন করা হয়, সঙ্ঘ সবচেয়ে বড়ো প্রতিরোধ হিসেবে দাঁড়িয়েছিল। হাজার হাজার স্বয়ংসবেক কারাবন্দি হয়। ভূমিগত আন্দোলনে সঙ্ঘের ভূমিকা নির্ণায়ক ছিল, যা প্রমাণ করে যে সঙ্ঘের বিচার সদা গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার রক্ষাকারী।

সেবা কাজ এবং রাষ্ট্রীয় বিপর্যয় : সঙ্ঘের ভাবনায়— **সেবাই রাষ্ট্রধর্ম**। আর তাই ১৯৯৯-এর ওড়িশা ঘূর্ণিঝড়, ২০০১-এর ভুজ ভূমিকম্প, ২০০৪-এর সুনামি, ২০১৩-র উত্তরাখণ্ড দুর্ঘটনা, ২০১৮-সালে কেরল বন্যা এবং ২০২০-তে করোনা মহামারী— প্রত্যেকবার সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা প্রথম সারিতে থেকে ত্রাণ এবং সেবা কাজ করে গেছেন, লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে খাবার, ওষুধ, শিক্ষা ও পুনর্বাসনের সেবা পৌঁছে দিয়েছেন।

শ্রীরামজন্মভূমি আন্দোলন (১৯৮০-২০২০) : অযোধ্যায় শ্রীরাম-মন্দির নির্মাণের জন্য জন-জাগরণ সঙ্ঘবিচারের শক্তি থেকেই সম্ভব হয়। কোটি কোটি মানুষকে একটি লক্ষ্যের সঙ্গে যুক্ত করা শুধুমাত্র সঙ্ঘের সংগঠনের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে। এটি ভারতীয় সংস্কৃতির আত্মাকে পুনঃস্থাপন করার রাষ্ট্রীয় বিচার ছিল।

গ্রাম উন্নয়ন এবং সামাজিক সাম্য (২০০০-২০২৫) : সঙ্ঘের প্রেরণায় সেবা ভারতী, বনবাসী কল্যাণ আশ্রম, বিবেকানন্দ কেন্দ্র প্রভৃতি সংগঠন লক্ষ লক্ষ গ্রামে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্বনির্ভরতার কাজ করে চলেছে। জাতিভেদ দূর করে সামাজিক ঐক্যের ভাব গড়ে তুলছে। যার ফলে সমাজে **আমরা সবাই সমান** এরূপ চেতনা শক্তিশালী হয়ে উঠছে। আর এমন সামাজিক সাম্যের ভাবই হলো ভারতের রাষ্ট্রীয় বিচার।

শত বছরের যাত্রায় সঙ্ঘ প্রমাণ করেছে যে, সঙ্ঘের ভাবনা কোনো দল বা একক ব্যক্তির ভাবনাপ্রসূত নয়, এটি ভারতীয় সংস্কৃতি ও দার্শনিক চিন্তার চিরন্তন ধারার উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় জীবনপ্রবাহের দীর্ঘ নিরীক্ষণ, পর্যালোচনা, সমকালীন পরিস্থিতি সংক্রান্ত বিচার-বিশ্লেষণ, সহজ কথায় দীর্ঘ গবেষণার ফসল বা পরিণাম হলো সঙ্ঘ। ঋগ্বেদে বলা হয়েছে— **সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্,** অর্থাৎ সবাই একসঙ্গে চল, একসঙ্গে কথা বল, সবার মন এক হোক। এই ঐক্যের বাণীই সঙ্ঘের মূল প্রাণশক্তি।

এই ভাবনা ঐক্য, আত্মগৌরব ও সেবার ভিত্তিতে দাঁড়িয়েছে। তার ভাবনা কোনো সীমিত গোষ্ঠীর নয়, সমগ্র ভারতের ভাবনা। স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে দেশ বিভাজন, যুদ্ধ থেকে জরুরি অবস্থা, দুর্যোগ থেকে সামাজিক পুনর্জাগরণ— প্রত্যেক সময় সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা রাষ্ট্রের সঙ্গে একাত্ম ছিলেন। সঙ্ঘের ধারণা হলো সে ভারতের আত্মা তার সংস্কৃতিই— এই ভাবনা স্বামী বিবেকানন্দ এবং অন্যান্য মহাপুরুষের বাণীতে বারবার প্রতিফলিত হয়েছে।

পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত একাত্ম মানবদর্শনই সঙ্ঘের সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির রূপ। এতে ব্যক্তি, সমাজ ও প্রকৃতির একাত্মতার কথা বলা হয়েছে, যা ভারতীয়তার জীবন্ত দর্শন। স্বামী বিবেকানন্দের শব্দে— **উঠো, জাগো এবং তোমার লক্ষ্য অর্জন না হওয়া পর্যন্ত থেমো না,** সঙ্ঘের জীবন এই বাক্যের বাস্তবায়ন।

সঙ্ঘের ভাবনা ও কার্যক্রমের সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা— ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে সঙ্ঘের ভাবনা কেবল অতীতের স্মৃতিচারণ বা সংগঠনের কার্যপদ্ধতিমাত্র নয়, বরং এটি আজকের ও ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জের সমাধানের জীবন্ত দিকনির্দেশও বটে। স্বামী বিবেকানন্দের যে স্বপ্ন— **এক শক্তিশালী, আত্মনির্ভর, আধ্যাত্মিক ভারত,** সঙ্ঘের কার্যপদ্ধতি ও আদর্শগত বিচারধারা সেই স্বপ্নেরই বাস্তব রূপ।

আজ আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে সমাজে বিভাজন সৃষ্টিকারী শক্তি কতটা সক্রিয়; মূল্যহীন শিক্ষা, পশ্চিমি ভোক্তাকেন্দ্রিক প্রবণতা ক্রমশ আমাদের জীবনমূল্য ধ্বংস করে চলেছে; সমাজ রাজনৈতিক অস্থিরতা ও জাতি-পন্থার ভিত্তিতে বিভক্ত হচ্ছে, সাংস্কৃতিক ও নৈতিকতার মাধ্যমে জীবন্ত হয়। সঙ্ঘ ব্যক্তির মধ্যে অনুশাসন, ত্যাগ, সেবা ও আত্মগৌরবের সংস্কার প্রবাহিত করে তাকে সমাজ ও রাষ্ট্রের হৃদস্পন্দনের সঙ্গে সংযুক্ত করে।

এই ভাবনা ব্যক্তি থেকে পরিবার, পরিবার থেকে সমাজ এবং সমাজ থেকে রাষ্ট্র— পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে গতিশীল করে। রাষ্ট্র তখনই শক্তিশালী ও স্থায়ী হতে পারে, যখন তার নাগরিকরা ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে, স্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিঃস্বার্থভাবে সমাজের কল্যাণে আত্মনিবেদিত হবে। এটাই রাষ্ট্রের গঠন ও সংরক্ষণের দার্শনিক, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ভিত্তি।

আজ যখন ভারত বিশ্বগুরু হয়ে ওঠার পথে অগ্রসর হয়েছে, তখন সঙ্ঘের বিচার আলোকবর্তিকার মতো। সঙ্ঘের সিদ্ধান্ত হলো, ব্যক্তিগত পরিবর্তন, সামাজিক পরিবর্তন, রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন। সঙ্ঘ আমাদের স্মরণ করায় যে— রাষ্ট্র সর্বোচ্চ, সমাজের ঐক্যই শক্তি, সেবাই প্রকৃত রাষ্ট্রধর্ম, সংস্কৃতি হলো রাষ্ট্রীয় আত্মা। উপনিষদে ধ্বনিত হয়েছে— **আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ,** অর্থাৎ নিজের মুক্তির জন্য ও সম্পূর্ণ জগতের কল্যাণের জন্য— সঙ্ঘকাজ এই আদর্শকেই মূর্তরূপ প্রদান করে। ব্যক্তি নির্মাণ কেবল নিজের জন্য নয়, বরং সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য। সমাজের সংগঠন কেবল বর্তমানের জন্য নয়, বরং অনন্ত ভবিষ্যতের জন্য এবং রাষ্ট্রের সাধনা কেবল নিজের উত্থানের জন্য নয়, বরং সম্পূর্ণ বিশ্বের কল্যাণের জন্য। এই কারণে সঙ্ঘের বিচার আজও ততটাই প্রাসঙ্গিক যতটা ১৯২৫ সালে ছিল এবং ভবিষ্যতের স্বনির্ভর গৌরবশালী ভারতের নির্মাণের জন্যও পথপ্রদর্শক রূপে সঙ্ঘের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সঙ্ঘের বিচার রাষ্ট্রের বিচারের থেকে আলাদা নয় এবং সেটিই তার প্রকৃত রূপ। সঙ্ঘের কার্যধারায় স্পষ্ট হয় যে, তার বিচার সর্বদা রাষ্ট্রেরই কল্যাণমুখী। স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে শুরু করে যুদ্ধ দুর্যোগ কিংবা সামাজিক পুনর্গঠন— প্রতিটি ক্ষেত্রে সঙ্ঘ প্রমাণ করেছে যে, তার বিচার রাষ্ট্রের বিচারের সঙ্গে একাত্ম। সঙ্ঘ যে ঐক্য, আত্মগৌরব সেবার বাণী প্রচার করে, সেটিই তো ভারতীয় রাষ্ট্রচেতনার মূল। □

গল্পকথায় ডাক্তারজী

(৪৪)

প্রথম সঙ্ঘ শাখা

সঙ্ঘে এখন 'শাখা' অর্থে যা বুঝি প্রথমটায় তেমন ছিল না। সঙ্ঘের জন্য 'সঙ্ঘ' শব্দই ব্যবহার হতো আর তার ক্রিয়াকর্ম ছিল নাগপুর কেন্দ্রিক। সঙ্ঘ পরিচিতি বাড়াবার উদ্দেশ্যে ডাক্তারজী একবার ওয়ার্ধা জেলার আর্বীতে ঘোষবাদ্য-সহ পথ সঞ্চলনের ব্যবস্থা করেন। এই শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমানের সংঘাত শুরু হলো। কিন্তু এবার ফল হলো উলটো। কারণ এবার হিন্দুরা সঙ্ঘবদ্ধ। এর আগেও এমন উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি হলে ডাঃ মুঞ্জে, ডাঃ হেডগেওয়ার সেখানে গিয়ে মীমাংসার জন্য আলোচনা করতেন। সঙ্গে হিন্দুদের সঙ্ঘবদ্ধ, সতর্ক থাকারও কর্মসূচি তৈরি করতেন। আন্না সোহনী সেখানে লাঠি খেলার প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করেছিলেন। ১৯২৬ সালে 'দশহরার' শোভাযাত্রা নিয়ে আবার মুসলমানরা আক্রমণাত্মক হয়ে উঠলো। ব্রিটিশ শাসনও নিষেধাজ্ঞা জারি করে তাদের সঙ্গ দিল। তাই এক মাস পরে বিজয়াদশমীর সেই উৎসব পালন হলো। এই উপলক্ষ্যে আমন্ত্রিত হয়ে ডাঃ মুঞ্জে, ব্যারিস্টার গোবিন্দরাও দেশমুখ, ডাঃ হেডগেওয়ার এবং ডাঃ এনবি খারে সেখানে যান এবং অনুষ্ঠানে জোরালো ভাষণ দেন। নাগপুরে ফিরে আসতেই শোনা গেল মুসলমানরা আবার স্বরূপ ধারণ করেছে। কিন্তু এবার দাঙ্গা করতে গেলে হলো উলটো— চারজন মুসলমান মারা গেল। শুরু হলো পুলিশি ধরপাকড়। এর ফলে চোদ্দজন হিন্দু নেতৃস্থানীয়কে গ্রেপ্তার করা হয়। মামলা চললে সবাই ছাড়া পেলেও ১৯২৬ সালের ১৩ ডিসেম্বরের রায়ে ডাঃ মোরীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। ডাক্তারজীর কাছে এই রায় ছিল খুব বেদনার। ১৯৩৪ সালে তাঁর মুক্তি লাভ পর্যন্ত তিনি নিয়মিত জেলে যেতেন তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য। ডাক্তারজীকে এই সময় স্বাবাবিকভাবেই ওয়ার্ধাতে খুব যাতায়াত করতে হতো। এই সময় ডাক্তারজী আপ্পাজী জোশীকে সঙ্ঘের কথা বলতেন। আপ্পাজী নিজের কাজে নাগপুরে আসতেন। তিনি নাগপুরে এলে ডাক্তারজীর বাড়িতেই থাকতেন। সেদিন ডাক্তারজীর ঘরে সঙ্ঘের বৈঠক চলছিল। ডাক্তারজী আপ্পাজীকে বৈঠকে অতিথি আসনে বসালেন। সেখানে সম্মুখে ছিল গৈরিক পতাকা এবং রাখা হয়েছিল হনুমান মূর্তি। ডাক্তারজী সেদিন বৈঠকে বক্তব্যও রাখলেন, শেষে প্রার্থনা। পরবর্তীতে ১৯২৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি ডাক্তারজী যখন ওয়ার্ধা গেলেন, সেখানে সঙ্ঘের শাখা শুরু হয়ে গেল। সঙ্ঘরূপী ভাবী বটবৃক্ষের প্রথম শাখা বিস্তার লাভ করল ওয়ার্ধাতে। 'সঙ্ঘ' তখন থেকেই সাধারণ ভাবে 'শাখা' শব্দ দিয়ে পরিচিত হতে থাকলো। মোহিতের ধ্বংসপ্রাপ্ত রাজবাড়ির অংশে উদীয়মান সঙ্ঘসূর্যের আলো পৌঁছতে শুরু করল দূর থেকে দূরান্তে।

(৪৫)

মাটিতে দাঁড়িয়ে

আর্যসমাজের প্রাজ্ঞ সন্ন্যাসী, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম অগ্রদূত তথা হিন্দু জাগরণের মহান ব্যক্তিত্ব স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে ১৯২৬-এর ২৩ ডিসেম্বর আব্দুল রশিদ নামে এক জেহাদি নির্মমভাবে হত্যা করে। মোপলা বিদ্রোহের সময়ে অজস্র হিন্দুহত্যা ও ব্যাপক ধর্মান্তরণের পরে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ শুদ্ধি আন্দোলনের মধ্যে হিন্দুত্বের চেতনা বৃদ্ধি ও হিন্দু সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর হত্যাকারী রশিদকে মুসলমানরা 'গাজী' বলে সম্মানিত করল। তাকে নিয়ে উৎসব শুরু করল। মুসলমানদের মানসিকতা ও কুকীর্তির বিষয়ে গান্ধীজী সহমত হলেন। এদের এই মনোভাব সম্পর্কে জর্জ বার্নার্ড'শ এক জায়গায় লিখেছেন--- 'সহিষ্ণুতার মতো মূর্খতা মুসলমানদের মধ্যে নেই। হয় আপনি তার আল্লাকে স্বীকার করে নিন, নয়তো সে আপনার গলা কেটে ফেলবে এবং তার ফলে আপনাকে 'দোজখ' (নরক) যেতে হবে এবং সে 'বেহেস্ত' (স্বর্গ) লাভ করবে'। এই সময় কেউ যদি ডাক্তারজীর সামনে বলতো— 'অমুক জায়গায় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা হয়েছে' তাহলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে থামিয়ে দিয়ে বলতেন--- 'মুসলমানদের দাঙ্গা বললাই ঠিক হবে। কারণ হিন্দু বেচারারা নিজেদেরই রক্ষা করতে পারে না তাঁরা দাঙ্গা করবে কীভাবে? নাগপুরে মুসলমানরা মাঝে মাঝেই দাঙ্গার ও ভয়ের পরিবেশ তৈরি করতে, হিন্দু যুবক তরুণদের একা বা দুজন গেলে গলির মধ্যে নিয়ে গিয়ে মারধর করত। এবার ডাক্তারজী একেবারে মূলে গিয়ে প্রতিকার করতে চাইলেন। ডাক্তারজী নিজে এবং গোবিন্দরাও চেলকর, রামচন্দ্র কোষ্ঠী, আন্না সোহনী প্রমুখ সাতজন লম্বা চওড়া বিশাল দেহের পূর্ণ যুবক মালকোঁচা মারা ধুতি, সাদা জামার উপর খাকি কোট ও মাথায় কালো খাদির টুপি পরে, মোটা লাঠি হাতে নিয়ে মুসলমান গুন্ডাদের মহল্লায় ঘুরতে শুরু করলেন। এক হাতে লাঠি ও বিশাল চেহারার যুবকদের দেখে গুন্ডারা বেশ ভয় পেয়ে গেল। একবার শুধু যাওয়ার পরে সে এলাকায় ভাগিয়ে নিয়ে যাওয়া এক হিন্দু মেয়েকে মুসলমানরা ফেরত দিয়ে যায়। এমন সুনিয়োজিত ভাবে লাঠিধারী স্বয়ংসেবকদের জায়গায় জায়গায় মজুত রেখে সময়মতো জেহাদি মুসলমানদের উচিত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে অনেকবার। ডাক্তারজীর বাড়িতে ঢিল মারা, আগুনের মশাল ছোঁড়া ইত্যাদি অপকর্ম অনেক হয়েছে। হত্যা করার কথা বলেও চিঠি পাঠানো হয়েছে। ডাক্তারজীর নিজের লোকেরা পরামর্শ দিলেন— রাতবিরেতে শক্ত সমর্থ দুজন রক্ষী নিয়ে চলতে। একবার মহারাষ্ট্র পত্রিকায় সম্পাদক গোপালরাও ওগলেখোঁজ নিলে ডাক্তারজী উত্তর দিলেন— 'আমিতো রক্ষী নিয়েই চলি। কোথায়! জিজ্ঞেস করাতে ডাক্তারজী হাসতে হাসতে পাশের এক কিশোর স্বয়ংসেবককে দেখিয়ে দিলেন। এমন নির্ভীকতা, সংগঠন কুশলতা এবং অবস্থানুসারে যোজনা তৈরির ক্ষমতাই ছিল ডাক্তারজী সমস্ত শক্তির উৎস।

সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস